মীনা রাখি সাধিকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK
2021

সাধিকা

ভর দুপুরে সত্যিই আমাকে অত দূরের মহাশ্মশানের দিকে পা বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত হতে দেখে সুরসিক শ্রী মুখোপাধ্যায় ফাঁপরে পড়লেন যেন। অনেকটা নিজের ওপরেই দোষারোপ করে বললেন, পাগলকে সাঁকো নাড়তে নিষেধ করে মুশকিলে পড়া গেল দেখি! তাছাড়া আজও সে ব্যাটা বেঁচে আছে কিনা ঠিক কি, কতকাল আর ও-পথ মাড়াইওনি দেখিওনি ওকে

ঝোলাটা কাঁধে ফেলতে ফেলতে বললাম, লেটেস্ট খবরটা আমিই আপনাকে দিতে পারব তাহলে, দেখে আসি

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আমার কানে কানে বললেন, কাঁধে আবার ঝোলা কেন, রাধু ভৃঙ্গীর হৃদয় জয় করার কিছু রসদটসদও সঙ্গে নিলেন নাকি?

হেসে জবাব দিলাম, না, ওটা আমার পর্যটন-সঙ্গী…তবে আগে জানলে ভাবতাম।

সাদা কথায় ঝোলাতে সুরার বোতল-টোতল কিছু আছে কিনা সেই ঠাট্টা করেছেন তিনি। শ্রী মুখোপাধ্যায়ও সেটা বুঝেছেন, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে আমার খেয়ালটা নাকচ করতে চাইলেন তিনি। বললেন, আরে বাবা সে কি এখানে, যেতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, কি ফ্যাসাদে পড়ো ঠিক আছে, যে দিন-কাল পড়েছে।

এই স্থানে আমার পদার্পণও এক আকস্মিক খেয়ালের ব্যাপার বললে অত্যুক্তি হবে না। এসেছিলাম শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে। বয়সের দোষে চোখের প্রসাদ আর নিভৃতের বর্ণবৈচিত্র্য কতটা খোয়া গেছে জানি না, বহুবারের দেখা এই উৎসবের সবটাই ছকে বাঁধা আনুষ্ঠানিক মনে হচ্ছিল। আসল কথা, কবি-গুরুর চিরকিশোর রসের কারিগরটি যে কারণেই হোক আমার মধ্যে যে একেবারে অনুপস্থিত সেটাই অনুভব করছিলাম। দুদিনেই হাঁপ ধরে গেছল, অথচ হাতে ঢালা অবকাশ।

www.bengaliebook.com

ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়েছিলাম। স্টেশনে এসে এই লাইনের একেবারে শেষ মাথার এক জায়গার টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেছি। সেখানে আমার এক আত্মীয় থাকেন, দিনকতক তার কাছে কাটিয়ে আসা যাবে।

কিন্তু টিকিট যেখানকারই কাটি, সেটাই যে গন্তব্যস্থান হবে তার কি মানে! মোটকথা আমার গন্তব্যস্থান আমি নিজেই জানতুম না। দিগন্তছোঁয়া ধানকাটা শুকনো মাঠ আর শীতের শুকনো খাল-বিল দেখতে দেখতে দুচোখ ক্লান্ত। দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই তবু ঝিমুনি এসে গেছল।

শীতের ছোট বেলা পড়-পড় তখন। এক জায়গায় ট্রেনটা থামতে চোখ মেলে আর তারপর জানলায় ঝুঁকে স্টেশনের নামটা দেখে নিতে গেলাম।

যোগাযোগ বলতে হবে। সেই মুহূর্তে আমার গন্তব্যস্থল বদলে গেল। স্টেশনের নামটাই হঠাৎ যেন আমাকে ঘাড় ধরে টেনে নামাতে চাইল। ট্রেন বড়জোর এক মিনিট দাঁড়াবে, তার মধ্যে আধ মিনিট কাবার। ঝোলাটা টেনে নিয়ে ব্যস্ত সমস্তভাবে দরজার দিকে এগোলাম। পাশের যে বয়স্ক ভদ্রলোকটির সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আগেও গল্প করছিলাম, আমার কাণ্ড দেখে তিনি হাঁ। কারণ আমার গন্তব্যস্থান কোথায় সহযাত্রীর স্বভাবগত কৌতূহলে আগেই তিনি জেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার বিস্ময় নিরসনের আর সময় ছিল না। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামতেই জানলা দিয়ে ঝুঁকে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ও মশাই আপনি এখানে নামলেন যে?

জবাবদিহি করলাম, এখানে একজনের কথা মনে পড়ে গেল তাই

এতক্ষণ কোনো পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন কিনা ভদ্রলোকের দুই গোল চোখে সেই সংশয়। ওদিকে গাড়ি ততক্ষণে আবার নড়েছে। ভদ্রলোক তখনো জানলায় ঝুঁকে আছেন। তাঁর মুখখানা দেখে কৌতুক বোধ করেছিলাম বলেই সেই মুখ দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

www.bengaliebook.com

প্ল্যাটফরম ততক্ষণে ফাঁকা। অল্প কয়েকজন লোক মাত্র নামা-ওঠা করেছে। আমি যখন বেরুলাম টিকিটটা নেবার জন্য গেটে চেকারও দাঁড়িয়ে নেই।

স্টেশন থেকে নেমে মাটিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গোটাচারেক সাইকেল-রিকশা একসঙ্গে যেন তেড়ে এলো আমার দিকে। মিলিত গলায় ডাকাডাকি রেষারিষি। সেই মুহূর্তের মধ্যেই মনস্থির করে ওদের সকলের উদ্দেশ্যেই মাথা নেড়ে সামনের নাক বরাবর একটি মাত্র সোজা রাস্তায় পা বাড়ালাম। দুদিকে ধানী জমির মাঝখান দিয়ে লাল মাটির উঁচু রাস্তা কম করে মাইলখানেক প্রায় সোজাই চলে গেছে। পথ হারাবার বা ভুলচুক করার সম্ভাবনা নেই। তারপর গাঁয়ে পা দিলে যাহে জিজ্ঞাসা করব সেই শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির হদিস বাতলে দেবে। এক বছরও হয়নি শ্রী মুখোপাধ্যায় নিজেই আমাকে বলেছিলেন, স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশয় উঠে আমার নাম কোরো, সে সোজা আমার বাড়িতে দরজায় এনে নামিয়ে দেবে তোমাকে। আর গায়ে পা দিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবে সে-ই বলে দেবে।–

বলা বাহুল্য যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির বাড়িতে ধূমকেতুর মতো আমি গিয়ে হাজির হতে চলেছি, ট্রেন থেকে স্টেশনের নাম দেখামাত্র এই শ্রী মুখোপাধ্যায়ের হাসি-খুশি মুখখানাই আমার মনে পড়েছে। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের নামটা অনুক্ত রাখার কারণ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আর তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের তালিকায় অন্তত ওটা সুপরিচিত নাম। তাঁর অনেক রচনা স্নাতক-পাঠ্য। তাছাড়া তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ বলতে কোনো খটমট বস্তু তাঁর গবেষণার বিষয় নয়, উল্টে বরং রসতত্ত্বের কারবারী হিসেবে তার সুনাম আছে। মোট কথা বিদগ্ধ জনের কাছে তিনি জ্ঞানী এবং গুণী হিসেবে শুধু সুপরিচিত নয়, বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রও। তাই কাহিনীর মধ্যে সরাসরি তার নামটা টেনে আনতে আপত্তি। আপত্তি আমার থেকেও তার বেশি। আসার আগে হাসিমাখা সস্নেহ অনুযোগে বলেছিলেন, বাড়ি গিয়ে এরপর কি করবে বুঝতেই পারছি, যাই করো তাই করো তোমাদের ওই গাঁজার চমকের মধ্যে আমার হাতেই যেন কল্কেটি চাপিয়ে দিও না।

শ্রী মুখোপাধ্যায় এই বর্ধিষ্ণু গাঁয়ের এক রক্ষণশীল নামী পরিবারের মানুষ। তার পিতৃপুরুষেরা নিষ্ঠাসহকারে ধর্মচর্চা করেছেন আবার নিষ্ঠাসহকারে নিজেদের জমিজমাও রক্ষা করে গেছেন। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের আমলে সেই ভিটেমাটি জমি-জমার পরিধি আরো বেড়েছে।

বছর দুই আগেও কলকাতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মাসে দুই একবার আসতেনই। নিজের বইপত্রের তদারকে আসতে হত, তত্ত্বতথ্যের গ্রন্থাদি ঘাঁটাঘাঁটির তাগিদেও আসার দরকার হত। তাছাড়া স্নেহবদ্ধ বহু শুভার্থীজনের তাগিদ তো ছিলই। বয়সের দরুন যাতায়াত ক্রমশ কমেছে। বছরখানেক হল আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তার দীর্ঘদিনের স্নেহের পাত্র। ওরকম খাঁটি স্নেহ এই যুগে বিরল। চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, দেহ-যন্ত্র ঢিলে-ঢালা হয়ে এসেছে, আর ছোটাছুটি পোষায় না, তাছাড়া যে দিন পড়েছে মনের অবস্থাও সর্বদা বিষ-বিষ। তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু নিজে না ছুটলে তো তোমাদের দেখা পাওয়া ভার।

এই চিঠিও মাস ছয়েক আগের।

...স্টেশনের নামটা চোখে পড়া মাত্র এই মানুষই দুখানা অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমাকে যেন হিড়হিড় করে টেনে নামিয়েছেন।

দেয়াল-ঘেরা অনেকটা জমির মধ্যে দালান-কোঠা। টিনের গেট সরিয়ে ভিতরে ঢুকলে মাঝের রাস্তাটা চক্রাকারে বেঁকে দালানের সিঁড়ির মুখে ঠেকেছে। এই পথটুকুতে আলো নেই বটে; তবু চাঁদের আলোয় বোঝা যায় রাস্তার একদিকে ফুলের বাগান অন্যদিকে সবজি অথবা ফলের ক্ষেত। টিনের গেট সরানোর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে। গোলাপের গন্ধের ছড়াছড়ি।

আমাকে দেখামাত্র বৃদ্ধের মুখের সেই বিস্ময় আর খুশির কারুকার্য ভুলব না। চোখের সামনে দেখেও তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

শ্রী মুখোপাধ্যায়কে এত কাছে আর এমন ঢালা অবকাশের মধ্যে আর কখনো পাইনি। নিঃসঙ্গ জীবনে আমি যেন তার পরম লোভনীয় কেউ

একজন। তার গৃহিণী সর্বদা পুজো আর্চা নিয়ে থাকেন আর তিনি নিজের পুঁথিপত্র নিয়ে। তাদের দুটি ছেলেই কৃতী এবং বাইরে হোমরাচোমরা চাকুরে। এখানে তার জ্ঞাতিরাই আছে জনাকতক, আর আশপাশে বয়স্ক ভক্ত আছে কিছু। এখানে আসার পরদিন সকালেই নিজের হাতে তিনি আমার বাড়িতে চিঠি লিখে জানান দিয়েছেন আমি এখানে আছি এবং দিন-কতক থাকব।

প্রথম দিন কয়েক একলা আমাকে কোথাও যেতে দেননি ভদ্রলোক। নিজে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন আর দূরে বেড়াবার ইচ্ছে দেখলে সাইকেল রিক্সা ডাকিয়ে আগের ভাগে তিনি ওতে চেপে বসেছেন। নিজেই আবার কৈফিয়ত করেছেন, তুমি অচেনা মানুষ, দিন-কাল ভালো নয় হে...

তার ভয়টা অনুমান করতে পারি। খবরের কাগজে ইদানীং এ অঞ্চলের আপদ বিপদ সম্পর্কে কিছু লেখালিখি চলেছে কলকাতা থাকতেই লক্ষ্য করেছি।

সন্ধ্যে না হতে বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। তখন ঘরে বসে কেবল গল্প আর গল্প। গোড়ায় গোড়ায় রাত বারোটা একটা বেজে গেছে। আমি বলেছি, আপনার শরীর খারাপ হবে যে, শুতে যান–

উনি বলেন, হুঃ তোমাদের আজকালকার ছেলে ছোকরার স্ত্রীর পেয়েছ!

সন্ধ্যার আসরে গৃহস্বামীর জনাকতক ভক্ত এসে যোগ দেন। একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। এখানকার মানুষদের সুখ সুবিধে আপদ বিপদের কথাই বেশি হয়। বর্তমানের নানা সমস্যা আর সেই সমস্যার দুর্নিরীক্ষ্য সমাধান নিয়ে মাথা ঘামান। আমি নীরব শ্রোতা।

খাওয়া-দাওয়ার পর সেদিন দুজনে মুখোমুখি গল্প করতে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, দিনকালের হাওয়া তো এই, আপনার যে এত জমি-জমা, লোকের চোখ টাটায় না?

শ্রী মুখোপাধ্যায় হেসে জবাব দিলেন, টাটানোটাই তো স্বাভাবিক, তবে আমি শুরু থেকেই কিছুটা ভাগ করে ভোগ করে আসছি বলে এখনো অনেকে সদয় আমার ওপর।...এটুকুও বেশি দিন থাকবে না, আর খারাপ দিন আসছেই তার কোন ভুল নেই।

-আপনার ভয় করে না?

-ভয় করে কি লাভ, তবে অস্বস্তি হয় বটে...এত বছরের লোভের সংস্কার চট করে কাটিয়ে ওঠা তো সহজ কথা নয় রে ভাই, তা যা খাবার ভাবনা একটু থেকেই যায়।

কারো প্রতি অভিযোগ নেই, নিজে সব ছেড়েছুঁড়ে দিতে পারছেন না সেটাই যেন সমস্যা। একটু বাদে অনেকটা নিজের মনেই তিনি যে কথাগুলো বললেন কান পেতে শোনার মতই। বললেন, ইংরেজ শাসন ফুরোবার ঢের আগে থেকেই এ-দেশের মানুষ তার নীচের মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়ে এসেছে। আর পঁচিশ বছরের এই স্বাধীনতার পরেও তার রকমফের হয়নি। নীচের মানুষ আর কতকাল নীচে পড়ে মার খাবে রে ভাই...এখন আমরা হায় হায় করলে কি হবে, যা হবার তাই হচ্ছে।

কথায় কথায় নিজের দেখা কিছু কিছু অত্যাচারের গল্প করলেন তিনি, প্রতিশোধের নেশা কেমন রক্তে এসে যায় সেটাই বক্তব্য।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ এমন একটা গল্প মনে পড়ল তার যার সামান্য কাঠামোটা শুনে আমি নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলাম। গল্পে গল্পে তখন অবশ্য আমরা দিন-কালের সমস্যার প্রসঙ্গ থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলাম। গল্পই করছিলাম আর গল্পই করছিলাম আর গল্পই শুনছিলাম। এরই মধ্যে তার ওই শোনা ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। শোনা ঘটনার পরিণামটা যে যথার্থ, তাতে কারো সংশয় নেই। কারণ শেষের ওই মর্মান্তিক ঘটনার সেই রঙ্গমঞ্চ এখান থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরের মহাশ্মশান। ..দীর্ঘকাল আগের সেই ব্যাপারটা শোনার পর বিভ্রান্ত হতচকিত হয়ে গেছল এখানকার মানুষ। পরে বুকের তলায় কাপুনি ধরেছিল সকলের। সে-দিনের অনেক বৃদ্ধ আজও বেঁচে আছে, রোমহর্ষক একটা দৃশ্য অনেকে চাক্ষুষ দেখেও

www.bengaliebook.com

এসেছে। তাই ব্যাপারটা পুরনো হয়নি আজও...মহাশ্মশানের কাঁপালিক বাবার আসন শূন্য পড়ে আছে এখনো, মাথা ঘামাক আর না ঘামাক এ-গল্প অন্তত এখানকার ছেলে-ছোকরারাও জানে।

দুয়ে দুয়ে যোগ করলে যেমন চার হয়, মহাশ্মশানের ঘটনা যারা দেখেছেন বা শুনেছেন তারা একটা সহজ যোগসাধন করেছেন আর তারপর তেমনি সহজ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যায় তাদের থেকে একটু বেশি জেনেছিলেন, একটু বেশি বুঝেও ছিলেন। কারণ সেই তরুণ বয়সে ওই মহাশ্মশানে তিনি প্রায়ই যেতেন আর তার ফলে সেখানকার একটি বিশেষ লোকের সঙ্গে তার হৃদ্যতা হয়েছিল।

...সেই লোকের নাম রাধু ভৃঙ্গী। শ্মশানে বাস তার, শবদাহ করা তার কাজ। ওই মহাশ্মশানে আর শবদাহ হয় না দীর্ঘ দিন হয়ে গেছে। কিন্তু রাধু ভৃঙ্গী আজও স্থান ত্যাগ করেনি, সেখানেই ডেরা বেঁধে আছে। সমস্ত ঘটনার একমাত্র সাক্ষী সে। আজও লোকটা সেই দিনের মতই স্মৃতির যন্ত্রণায় স্তব্ধ শোকাহত কিনা শ্রী মুখোপাধ্যায়। জানেন না।

.সেদিনের সেই ঘটনা আগুনের মতো এখানে ছড়িয়ে পড়তে উনিও মহাশ্মশানে ছুটে গেছলেন। অবশ্য গাঁয়ে ছিলেন না বলে তাঁর যেতে একটু দেরি হয়েছিল, তার পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছিল।...কিন্তু লোকটা ওই রাধু ভৃঙ্গী তার সেই পাথরের মতো বিশাল কুচকুচে কালো শরীরটা টান করে, কোমরে দুই হাত রেখে তার বাবার ডেরা আর মায়ের ডেরার মাঝের অশ্বত্থ গাছটার দিকে ঘাড় উঁচিয়ে চেয়ে হা-হা-হা-হা শব্দে হাসছিল। অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে এমন হাসি। ওর সেই হাসি নাকি সকালে আরো বেশি শোনা গেছে। সকলে ধরে নিয়েছিল লোকটা পাগল হয়ে গেল।

...শ্রী মুখোপাধ্যায় ওকে হাসতে যেমন দেখেছেন, দুই এক দিনের মধ্যে আবার স্তব্ধও হতে দেখেছেন তিনি। ওর মুখ থেকেই অসংলগ্ন এমন কিছু কিছু উক্তি শুনেছেন তিনি যে সমস্ত ব্যাপারটার কার্যকারণ তিনি অন্যভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন। আর তার ফলে, প্রতিশোধের নেশা রক্তে মিশলে

প্রাণপাত চেষ্টা করেও তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিনা সেই সংশয় আজও কাটেনি তার।

মোটামুটি ঘটনাটা শুনে আমিও স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম খানিক! কি ভেবে হঠাৎ উনি মন্তব্য করলেন, অনুমান যা-ই করি না কেন, আমার এখনো কিছু জানতে বাকি বুঝলে…ওই রাধু ব্যাটার সঙ্গেও কোনো একটা মেয়ে-টেয়ের লটঘট ব্যাপার ছিল কিছু। বুঝলে..কিন্তু ওই সাংঘাতিক ঘটনার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক সেটা আজও জানি না।

উৎসুক মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, এ-রকম ভাবছেন কেন?

-লোকটাকে কঠিন পাথর বনে যেতে দেখে একদিন সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিলাম, তুই তো মরদ আছিস রে, শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়া–! ও বিড়বিড় করে জবাব দিল, শক্ত তো আছি, কিন্তুক ভাবছি…। জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাবছিস? ও ঘোলাটে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত পলক পড়ে না, শেষে তেমনি বিড়বিড় করে বলল, মুন্নিকে আখুন কুথা পাই? আমি অবাক হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, মুন্নি কে? যত শুধোই একটা যন্ত্রণা যেন ওর সেই গোল গোল কালো চোখ দিয়ে ঠেলে বেরুতে থাকে–তারপর রেগে গিয়ে আমাকে তেড়ে মারতে এলো প্রায়। যে কদিন মুন্নির কথা জিজ্ঞেস করেছি, ও ক্ষেপে উঠেছে, যাচ্ছেতাই গালাগালি করে আমাকে তাড়াতে চেয়েছে। শেষে শাসিয়েই দিল, ফের ওর কাছে এসে ঝামেলা করলে ও চেলা-কাঠ দিয়ে মেরে আমাকে জন্মের মতো ঠাণ্ডা করে দেবে।…এর পরেও গেছি অবশ্য, শেষ গেছি বছর দশেক আগে, তখন অনেক ঠাণ্ডা মানুষ, গোড়ায় ভালো করে চিনতেই পারেনি, তারপর বলেছে, বাবার আসনটা খালি পড়ে থাকল, কেউ আলো না, কেউ বসল না, উ আসন খালিই থাকল রে বাবু…।

.

এ পথে পা বাড়াতে পেরেছি আরও দিন চারেক পরে। আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে বাড়ীর কর্তাটি শেষে সঙ্গে লোক দিতে চাইলেন। কিন্তু আমার তাতে প্রবল আপতি। এতদিনে আমি এপারে অনেকটা পরিচিতি

লাভ করেছি। তাছাড়া যে এলাকাটি আমার লক্ষ্য সেই জনমানবশূন্যস্থানে লোক-বসতির জটিল মানসিকতার কোনো ঢেউ গড়ায়নি। অতএব শ্রী মুখোপাধ্যায়ের যে দুশ্চিন্তার খুব একটা কারণ নেই সেটা তিনি নিজেও জানেন।

চলেছি…।

নির্জন পথে নিঃসঙ্গ চলার একটা আকর্ষণ আছে। দুই চোখ ভরাট করে করে চলার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পাবার আনন্দ আমার অনেকখানি রপ্ত। এক কথায় ব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থেকেও আমি নামে ছোট গণ্ডীর মানুষটাকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যেদিকে চোখ যায়, যতদূর চোখ যায় কেবল ধান। ক্ষেত আর ধান ক্ষেত। চারদিক থেকে যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে। ধান কেটে নেওয়ার ফলে ধু-ধু রিক্ত দশা। তারই ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা সরু পথ ধরে চলেছি। শীতকাল না হলে আলাদা-গোখরার ভয়ে অনেক ঘোরা-রাস্ত ধরতে হত। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট ঝোঁপ ঝাড় জঙ্গল। ধান ক্ষেতের সবুজের মিতালী খুইয়ে ওগুলো যেন নিঃসঙ্গ হয়ে আছে। উত্তর দিকে সরু একটা নদী। নদীটা হেজে মজে গেছে। শুনেছি বর্ষায় জল এলে এই নদীই চারদিকের চাষের জমি ভাসিয়ে দেয়। চাষীরা নাকি উপকারী বন্ধুর মতো ভাবে এই নদীটাকে। এটা আছে বলেই এখানে চাষ আবাদ আছে।

শুকনো নদী হেঁটে পার হলাম। মহাশ্মশানে পড়ল।

এই শ্মশানের পরিধি ভিতরে বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে। শবদাহ তো সর্বদাই। নদীর ধারে হয়ে থাকে, শ্মশান ভিতরের দিকে বিস্তৃত হল কেমন করে?

…হল, কারণ এক মহাতান্ত্রিক সাধকের পদার্পণ ঘটেছিল এখানে। তিনি জনসমাগমের ধারে কাছে থাকতে চাননি। ভিতরের দিকে চলে গিয়ে মনের মত নির্জন সাধনার জায়গা বেছে নিয়েছিলেন। লোকে বলাবলি করেছে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরে মহাতান্ত্রিক নাকি তার সাধনার স্থান খুঁজে

www.bengaliebook.com

পেয়েছেন। হাজার বছরের পুরনো এই মহাশ্মশান। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এইখানেই বহু দূরের মানুষেরও দাহ-কর্ম সম্পন্ন। হত। এখন গাঁয়ের লাগোয়া শ্মশান হয়েছে, এখানে আর শবদাহ হয় না।

কিন্তু আজও মহাশ্মশান বলতে এটাই।

নদীর ধার ছেড়ে খানিকটা ভিতরের দিক ধরে এগিয়ে চলেছি। কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। এমন কি একটা শেয়াল কুকুরও চোখে পড়ল না। তাই আপন অস্তিত্ব এখানে যেন বড় বেখাপ্পা রকমের সচেতন!

অনেকটা এগোবার পর একটা ছোট্ট জীর্ণ মন্দিরের কাঠামো চোখে পড়ল। আর ঠিক তখনি আমার সমস্ত তন্ময়তা একাগ্র হয়ে উঠল।…মন্দিরের থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে দুটো পর্ণকুটীরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বংসাবশেষ বলতে কতগুলো করে পোকায়-খাওয়া কাঠের থাম আর মাটির ভিত। মাথার ওপর চালা। নেই একটারও। এতকালের ঝড়ে জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

দুটো কুটীরের মাঝে চল্লিশ গজের মতো ফারাক। ওই দুটো ঘরের কাঠামোর মাঝে আজও সেই অশ্বথ গাছটা দাঁড়িয়ে–যেটার দিকে তাকিয়ে রাধু ভৃঙ্গী অট্টহাসি হেসে লোকের হাড়-পাঁজরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল।

ওই দিকেই আরো কম করে একশ গজ তফাতে আর একটা কুটীর। সেই তৃতীয় কুটীরও জীর্ণ কিন্তু এ-দুটোর মতো ভগ্নদশা নয়। মাথার ওপর চাল আছে। আমার মন বলে দিল ওটাই লক্ষ্য। ওখানে রাধু ভৃঙ্গী থাকে।…আগেও থাকত, এখনো থাকে।

কিন্তু এখানে আসার পর আমার যেন তাড়া নেই আর। হাতে যেন অঢেল সময়। স্থান মাহাত্ম্য কিনা জানি না।…একদিন এখানে লোক এসে আর নড়তে চাইত না। অনেকে রাতের পর রাত হত্যা দিয়ে পড়েও থাকত। পায়ে পায়ে আমি ওই ভগ্নজীর্ণ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু মন্দির বা মন্দিরের বিগ্রহ আমার চোখ টানছে না। উৎসুক চোখে খানিক দূরের বাঁধানো বেদীটার দিকে তাকালাম। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে

গেলাম।...না বেদীর ওপর বাঘের বা হরিণের কোনো চামড়ার আসন বিছানো নেই। থাকার কথাও নয়।

কারণ ওই বেদীটাই আসন। মহাতান্ত্রিক সাধকের সহস্রমুণ্ডীর আসন।

..আচ্ছা, সোজা গিয়ে যদি ওটার ওপর বসে পড়ি? কি হবে? কি বিপর্যয় ঘটবে? ...ভিতরটা কি সত্যিই জ্বলে যাবে? পুড়ে যাবে? জ্বলতে জ্বলতে পুড়তে পুড়তে সত্যিই কি মরণ ছোটা ছুটতে হবে আমাকেও?

যাক, আমি এখানে নাটক করতে আসিনি, চোখের ভোজ আর মনের ভোজের। এক অলক্ষ্য আমন্ত্রণ আমাকে এখানে টেনে এনেছে।

..সেই মহাতান্ত্রিক সাধক এইখানেই প্রথম সাধনায় বসেছিলেন। লোকে দূর থেকে দেখত তাঁকে, কাছে আসার সাহস ছিল না। প্রাণের দায়ে কেউ যদি কাছে আসত। চোখের আগুনে তিনি জ্যান্ত ভস্ম করতে চাইতেন তাকে। তাতেও কাজ না হলে চিমটে নিয়ে তাড়া করতেন। সে-রকম দরকার কমই হত, ভক্তর প্রাণ তার আগেই খাঁচা-ছাড়া হত প্রায়। কিন্তু মাঝেমধ্যে মহাতান্ত্রিক নিজেই আসতেন নদীর ধারে শবদাহ। দেখতেন, সকৌতুকে মৃতের আত্মীয় পরিজনদের কান্নাকাটি দেখতেন। একবার এক অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল। মায়ের একমাত্র সন্তান বছর দশেকের এক ছেলে মারা গেছে। সেই ছেলের মা পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছে। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারছে না। শ্মশানে এসেও সে ছেলেকে আঁকড়ে ধরে আছে, কিছুতে নিতে দেবে না। আত্মীয় পরিজনেরা নিরুপায় হয়েই দেহ ছিনিয়ে নেবার উপক্রম করছে।

অনতিদূরে মহাতান্ত্রিক দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ চিৎকার করতে করতে ছুটে এলেন। আত্মীয় পরিজনদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। তারপর গর্জন, ছেলেটার দেহে প্রাণ আছে এখনো, পাষণ্ডরা তাকে চিতায় দিতে যাচ্ছিস! তোরা যা, তোরা চিতায় উঠগে যা!

...আধ ঘণ্টার মধ্যেই সকলে দেখল সেই ছেলের দেহে প্রাণ আছে বটে! এই ঘটনার সাক্ষী কেউ নেই, কারণ এই মহাশ্মশানে মহাতান্ত্রিকের পদার্পণ

দেড়শ বছর আগের কথা কি তারও বেশি কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সদ্যদেখা কিছুর মতই ওই সাধুর কথা আর তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা আজও তাজা আছে।

যাক, তারপর থেকেই সাধুর নির্জন বাস ঘুচে গেল প্রায়। তার বুকের তলায় যে স্নেহমায়া মমতার ফল্গুধারা বইছে এটা গ্রামবাসীরা টের পেয়ে গেল। এরপর জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিয়ে তাড়া করেও ভক্ত হটানো যেত না।

তাদের ভিড় বাড়তেই থাকল, ভক্তিবাড়তেই থাকল। দূর দূরান্তে সাধুর মাহাত্মের কথা ছড়াতে থাকল। অলৌকিক উপায়ে সাধু মানুষের ব্যাধি দূর করছেন, দুর্দৈব খণ্ডন করছেন। সাধুর কৃপায় বাঁজা মেয়েমানুষও সন্তানবতী হয়েছে। জমির অজন্মা ঘুচে গিয়ে ফসলের জোয়ার এসেছে–এমন কত তাজ্জব কাণ্ড। সাধু মুশকিলআসান।

মুগ্ধ ভক্তের সংখ্যা বাড়ছেই, বাড়ছেই। তারা সাধারণ লোক, কাছের দূরের দশ গাঁয়ের মানুষ। তাদের উৎসাহে বিপুল টাকা সংগ্রহ হল, শ্মশানে ওই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা হল। আর প্রতিষ্ঠা হল মহাতান্ত্রিকের ওই সহস্র মুণ্ডীর আসন। তার বাসের পর্ণকুটীরও তৈরি করে দিল তারা। বছর ঘুরেছে অনেকগুলো। মহাতান্ত্রিক ওই সহস্রমুণ্ডীর আসনে বসেই দেহরক্ষা করেছেন।

এরপর শ্মশান থাকল, মন্দির থাকল, ভক্তদের আনাগোনাও অব্যাহত থাকল কিছুকাল। কিন্তু বাবার সহস্রমুণ্ডীর আসন শূন্য। আর সেই শূন্যতা সমস্ত মানুষের। বুকের তলায়। কে বসবে ওই আসনে? বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধু সন্ন্যাসীরা এসেছে, লোভে পড়ে বাবার আসনে বসেছে। কিন্তু দুদিনও টিকতে পারেনি। আসন ছেড়ে উঠে পাগলের মতো যেন মরণ ছোটা ছুটেছে তারা। আর আর্তনাদ-জ্বলে গেলাম, জ্বলে গেলাম–পুড়ে গেলাম! সেই সব সাধুদের গাঁয়ের কোথাও দেখা যেত না।

যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আসন তেমনি ফাঁকা। ওটা এমনি ভীতির কারণ হয়েছে যে আর কোনো সাধু তেজ দেখিয়ে ওতে বসতে চেষ্টা করে

না। খুব স্বাভাবিকভাবেই গাঁয়ের মানুষেরা ওই সিদ্ধাসনের কথা ভুলতে বসেছে।

হঠাৎ কাছে দূরের সব গায়ে বিষম চমক একদিন। সেই চমকের সাক্ষী শ্রী মুখোপাধ্যায়, তার সমসাময়িক আরো অনেক বৃদ্ধ। কাতারে কাতারে লোক ছুটল মহাশ্মশানের দিকে।

এত যুগ পরে মহাতান্ত্রিকের সেই সিদ্ধাসনে এসে বসেছে এক তরুণ সাধক। খুব বেশি হলে বছর উনিশ কুড়ি হবে বয়েস। একে একে তিনদিন অনাহারে ওই তন্ত্রাসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। মাথা বিগডোয়নি এতটুকু, কোনোরকম তাপ উত্তাপের চিহ্ন মাত্র নেই।

সেই তরুণ তান্ত্রিককে প্রথম আবিষ্কার করেছে রাধু চণ্ডাল। তার শ্রেণীর মধ্যে সে তখন ডাকসাইটে যুবক। শ্মশানে শবদাহ করে বটে কিন্তু স্বজাতীয়দের সঙ্গে থাকে না। দূরের ওই পর্ণকুটীরে বাস তার। আড়ালে সকলে বলাবলি করে, স্বভাব চরিত্র। ভালো না, রাতে মাঝে মাঝে মেয়ে নিয়ে আসে আর ভয়ানক নেশা করে বলে স্বজনের সঙ্গে থাকে না। সামনে কেউ কিছু বলে না কারণ, লোকটার স্বভাব যেমন দুর্দান্ত তেমনি উগ্র।

অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে সেই প্রথম এই তরুণ তান্ত্রিককে সহমুণ্ডীর আসনে তপোমগ্ন দেখেছে। নেশার ঘোরে কিছু দেখেছে কিনা নিজেরই সেই সন্দেহ হয়েছিল। পরপর তিনদিন তিনরাত ওই আসনে দেখেছে ওই বালক সাধুকে। ওই তিনদিন রাধু তার কাছ থেকে নড়েইনি বলতে গেলে। কাজেও যায়নি। কাণ্ড দেখে বুকের ভিতরে তোলপাড় শুরু হয়েছে তার। নতুন বাবাকে একবার চোখ খুলে তাকাতে পর্যন্ত দেখেনি।

তারপর সে-ই অপরকে জানান দিয়েছে। দেখতে দেখতে নতুন বাবার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

গাঁয়ের মানুষ নতুন বাবা বলেই ডেকেছে সেই কিশোর তান্ত্রিককে। শ্রী মুখোপাধ্যায়ও স্বচক্ষে দেখেছেন তাকে। ভয়ানক কৃশ দেহ, অথচ তাই থেকে সত্যিই যেন আগুনের ছটা বেরুচ্ছে। একমাথা ঝাকড়া চুল। বয়েস

কুড়ির মধ্যে মনে হয়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে রটনা শুরু হয়ে গেছে, বয়সের গাছ-পাথর নেই নতুন বাবার–কারণ সহস্রমুণ্ডীর সেই মহাতান্ত্রিকই নব দেহ ধারণ করে মানুষের কল্যাণের জন্য আবার ওই আসনে এসে বসেছেন।

তাকে দেখে ভিতরটা খচখচ করেছিল শ্রী মুখোপাধ্যায়ের। অমন একটি নিষ্পাপ কচি মুখ আর বুঝি দেখেননি।...এ কোথা থেকে এলো এই ভীষণ শ্মশানে? কোথায় ছিল, কোন মায়ের বুক খালি করে এই পথে ছুটে বেরিয়েছে?

জবাব পাননি।

নতুন উত্তেজনায় দিন কাটতে লাগল। দিনের পর দিন মহাতান্ত্রিকের সহস্রমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে নতুন বাবা সাধনায় নিবিষ্টচিত্তে বিকারশূন্য। একটি কথা বলে না, কারো দিকে তাকায় না। প্রায় অনাহারী।

ভক্ত-মানুষদের আনন্দ ধরে না। কত যুগের শূন্যতা ভরাট হয়ে গেছে। আপদে বিপদে তারা ছুটে যেতে পারবে কারো কাছে, কৃপার আশায় ধর্ণা দিতে পারবে। মহাতান্ত্রিকের সেই পর্ণকুটীরের স্থানেই নতুন বাবার কুটীর তৈরি করে দিল তারা। ভেট আসতে লাগল থরে থরে। ভক্তের সংখ্যা দলে দলে বাড়তে থাকল। নানা উৎসবে শ্মশান মেতে উঠল।

কিন্তু এত উৎসাহের এত মূলে যে নতুন বাবা তার কিন্তু কোন দিকে হুঁস নেই। অপার্থিব সাধনায় নিয়ত মগ্ন। সহস্রমুণ্ডীর আসনে উপবিষ্ট দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়। ভেট ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে। নিতান্ত খেয়াল হলে কিছু মুখে দেয়। আর নিতান্তই খেয়াল হলে কুটীরে এসে রাত্রি যাপন করে। নয়তো আসনে কাটায়, অথবা শ্মশানেই গড়াগড়ি দেয়।

এই নতুন বাবার প্রথম কৃপাধন্য রাধু-চণ্ডাল। ওকেই প্রথম চোখ মেলে দেখেছিল, আর ওর সঙ্গেই প্রথম বাক্যালাপ। প্রায়ই আর নিজের ডেরার যেত না রাধু। সমস্ত রাত কাছাকাছি বসে থাকত। নির্নিমেষে দেখত। ঘুমিয়ে

পড়লে চমকে জেগে উঠে আবার দেখত। ওর ধারণা নতুন বাবা ছদ্মবেশী মহাদেব ছাড়া আর কেউ নয়।

এমনি একটা রাতের তখন তিন প্রহর হবে বোধহয়। রাধু দেখে নতুন বাবা। ওর দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। শিউরে উঠে রাধু দুই হাত জোড় করল।

রাধু অবাক, নতুন বাবা হাসছে ওর দিকে চেয়ে!

–না খেয়ে এখানে পড়ে আছিস কেন?

সেই কণ্ঠস্বর কানে যেতে রাধুর সর্বাঙ্গে শিহরণ। জবাব দিয়ে বসল, তুমি তো কদিনের মধ্যে খাওনি।

নতুন বাবা আরো হাসল, বলল, তুই ব্যাটা পাজীর শিরোমণি। বলে সামনের ছড়ানো খাবার তুলে নিয়ে ওর হাতে দিল, নে খা–।

নিজেও খেল।

আনন্দে আত্মহারা রাধু বলেছে, তোমাকে আমি ঠিক চিনলাম গো, তুমি মহাদেও!

আবার সেই হাসি।–তা চিনবি না, তুই যে আমার নন্দীভৃঙ্গীর একজন…তুই ভৃঙ্গী।

সেই থেকে রাধু চণ্ডাল রাধু ভৃঙ্গী! আর তারপর থেকে ও যেন নতুন বাবাকে খাওয়াবার একটা ফিকিরও পেয়ে গেল। বাবা দুদিন না খেলেই ও নিজেও না খেয়ে বসে থাকে। বাবা রেগে যায় আবার হাসেও। সেই হাসি দেখলে মনে হয় তিন বছরের একটা কচি ছেলে হাসছে। ৬৮৪

তাকে শ্মশানের মাটিতে গড়াতে দেখলে কুটীরে নিয়ে যাবার জন্য রাধুর ভিতরটা ছটফট করতে থাকে। কিন্তু খাওয়াবার মতো সে-রকম কোনো বুদ্ধি মাথায় আসে না।

ছমাসের মধ্যে মহাশ্মশানে দ্বিতীয় চমক আবার।

দ্বিধা-দ্বিপ্রহর সেদিন। মাথার ওপর সূর্যটা আগুনের গোলার মতো জ্বলছে। পা ফেলা যায় না শ্মশানের মাটি এমন তপ্ত। শ্মশান খাঁ-খাঁ করছে, রোদ চড়ার আগে ভক্তরা বিদায় নিয়ে গেছে। সকাল থেকে সেদিন আর নতুন বাবাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেনি কেউ। সহস্রমুণ্ডীর আসনে গত রাত্রি থেকে সমাসীন, তপোমগ্ন।

হঠাৎ নিজের কুটীরে বসে রাধুর মনে হল ওই নির্জন দুপুরে ধ্যান-নিবিষ্ট বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ। রাধু দিনমানেই ডেরায় লুকিয়ে মদ খাচ্ছিল। এখন এ জিনিসটা লুকিয়ে-চুরিয়ে খেতে হয়–বাবা টের পেলেই ধমক-ধামক করে। রাধু অবশ্য বলে, মহাদেওর ভৃঙ্গী নেশা করলে দোষ কি! প্রসন্ন থাকলে বাবা সেই কথা শুনে। হাসে।

দুচোখ ভাল করে রগড়ে নিয়ে দেখতে লাগল রাধু ভৃঙ্গী। ঠিক দেখছে না মদের ঘোরে দেখছে? কারণ বাবার সামনে এক রমণীকে দেখছে সে। এক পিঠ খোলা। চুল কোমরের নীচে নেমে গেছে। পরনে থান। সোনার বরণ দুই হাত কোমরে।

রমণী অবশ্য অনেক আসে, কিন্তু এই নির্জনে একলা কে আসবে? পাগল-টাগল নাকি!

নেশার পাত্র রেখে রাধু ছুটে এলো। তারপর হতভম্ব সে। রমণীই বটে। কিন্তু এমন রূপসী রমণী কি সে আর দেখেছে? তার সর্বঅঙ্গ যেন আগুনের লাল হল্কা নিয়ে তৈরি। রমণী বাবাকে দেখছে। দেখছেই দেখছেই দেখছেই। তার চোখ দিয়ে। মুখ দিয়ে সর্বঅঙ্গ দিয়ে যেন আগুনের তাপ ঝরছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকে দেখছে রাধু ভৃঙ্গী।

হঠাৎ এতবড় শ্মশানের স্তব্ধতা খানখান করে রমণী হেসে উঠল। খিল খিল হাসি। এমন রক্ত জল করা বেদম হাসিও রাধু আর দেখেনি বা শোনেনি।

হাসছে। তো হাসছেই। দুই হাত কোমরে তখনো। হাসির দমকে সেই অবস্থায় তার অঙ্গ বেঁকে চুরে যাচ্ছে।

রাধু ভাবল, এ পাগলিনী। নইলে কাঠফাটা রোদে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কেউ হাসতে পারে না।

কিন্তু পরক্ষণে তার কথা শুনে রাধু বিষম চমকেই উঠল বুঝি। রমণী হাসছে তেমনি আর বার বার করে বলছে, আমি চিনেছি ঠিক চিনেছি, তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে ভেবেছ? আমাকে?

আবার সেই হাসি।

রাধু নিস্পন্দ। কিন্তু যাকে দেখে রমণীর এত হাসি এত উল্লাস, সেই নতুন বাবা তেমনি স্থির নিশ্চল ধ্যানমগ্ন। একবারও চোখ মেলে তাকায়নি, হাসিতে বা কথার এতটুকু রেশ কানে ঢোকেনি।

এই ব্যতিক্রমটা রমণীরও চোখে পড়ল যেন, মুখের হাসি মেলায়নি, আবার ভুরু কুঁচকে দেখতে লাগল বাবাকে। তারপর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, চিনেছি, ঠিক চিনেছি, ঠিক ঠিক ঠিক

রাধুর নেশা ছুটে গেছে ততক্ষণে। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে।

রমণীর চোখে এবার হাসির আগুন ঝরল। বলল, হাঁ মহাদেও–আর তুই বুঝি তার চেলা?

সভয়ে মাথা নাড়ল রাধু। বলল, আমি ভৃঙ্গী।

আবার এক পশলা হাসি। হাসির শেষে বাবার দিকে ফিরল। বাবা তেমনি তপোনিবিষ্ট। রমণী ভুরু কুঁচকে এবারে একটু বিস্ময়ভরেই দেখতে লাগল তাকে।

নতুন বাবাকে চিনেছে শুনেই আর পাগল-টাগল ভাবার সাহস নেই রাধুর। সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে আছ গো মা?

-আমি? আমি কে দেখেও চিনতে পারছিস না হাঁদা কোথাকারের! জ্বলজ্বল মুখখানা বাবার দিকে ফেরালো আবার।-হ্যাঁ রে, তোর মহাদেওর চোখ-কান সব আছে তো, না-কি খেয়ে বসে আছে?

রাধু হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

বিকেলের মধ্যে এক গা ছেড়ে তিন গাঁয়ে রটে গেল ব্যাপারটা। তারপর আরো দূরে দূরে। দলে দলে লোক ছুটল মহাশ্মশানের দিকে। এই বিচিত্র রমণীর আগুনের মত রূপ দেখে নির্বাক, তার উচ্ছল হাসি দেখে এস্ত, কথা শুনে হতভম্ব। তাকে দেখার আগে সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্য একরকম, আবার দেখার পরে অন্যরকম। দেখার পরে রসালো মন্তব্য করতে বা জটিল কিছু ভাবতে ভয়।

বাবার বিশেষ স্নেহের পাত্র হিসেবে রাধু ভৃঙ্গীর তখন ভক্তদর্শকদের কাছে বিশেষ প্রতিপত্তি। বাবার সঙ্গ নিয়ে আছে অতএব তার মতামত ফেলনা নয়। তার মন্তব্য নতুন শ্মশানচারিণী কোনো মহাযোগিনী না হয়ে যায় না। নইলে এসেই বাবাকে চেনে কি করে, অমন করে হাসে কি করে, অমন সব কথা বলে কি করে?...এই ওই বাবার খেলা কি ওপর থেকে বাবার বাবার খেলা কে জানে! মায়ের দিকে তাকালে আমার তো হাড়ে কাপুনি ধরে গো বাবুরা!

তিন দিনের মধ্যেও ওই অদ্‌ভুত রমণী যখন মহাশ্মশান ছেড়ে নড়ল না সকলে ধরেই নিল এখানে থাকবে বলেই এসেছে। নতুন বাবা তাকে দেখে একটুও অবাক হয়নি, তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কোন কথাই বলেনি, তাকে থাকতেও বলেনি তাড়িয়েও দেয়নি। নতুন বাবা নির্বিকার। দুদুটো রাত যুবতী রমণীকে শ্মশানে খোলা আকাশের নাচে কাটাতে দেখে তৃতীয় রাতের দ্বিতীয় বামে নতুন বাবা আঙ্গুলের ইশারায় রাধুকে নিজের পর্ণকুটীর দেখিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ একে ওইখানে গিয়ে থাকতে বলো।

বাবার ইঙ্গিত বুঝে মা-টি নাকি তার মুখের ওপরেই সেই প্রথম দিনের মতো খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। তারপর সত্যিই বিনা দ্বিধায় বাবার কুটীরে গেছে রাধুর সঙ্গে। রাধুর জ্বালানী কাঠের আলোয় সকৌতুকে ঘরটা

দেখেছে, তারপর বলেছে, খাসা ঘর, আমার জন্যেও এমনি একটা ঘর তুলে দিস তো। তারপর বলেছে, যা পালা এখন, দুরাত্তির না ঘুমিয়ে আমার বেজায় ঘুম পেয়েছিল সেটা তোর মহাদেও বাবা বুঝেছে দেখছি।

এই বিচিত্র রমণী যে মহাসাধিকা কোনো তাতে আর কারো সন্দেহ থাকল না। নইলে এই বয়সে এমন রূপ যৌবন নিয়ে সমস্ত ভয়-ডর বিসর্জন দিয়ে এভাবে কেউ শ্মশানবাসিনী হতে পারে?

গাঁয়ের মানুষেরা তাঁর নাম দিয়েছে বামাসাধিকা। শুনে এই রমণী নিজেই হেসে বাঁচে না। বলে, বামা তো বটে কিন্তু সাধিকা আবার কি রে মুখপোড়ারা!

ভক্তরা তোড়জোড় করে অশ্বথ গাছটার ওপাশে বামাসাধিকার পর্ণকুটীর তুলে দিয়েছে। সেই কুটীর দেখে সাধিকার আনন্দ ধরে না।

যত দিন গেছে, একটা ধারণা রাধুর বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বাবার সেবার তরেই সাধিকা-মা এখানে এসে শ্মশানবাসিনী হয়েছে। হয়তো এই সেবাটাই তার আসল সাধনা। বাবা যেন ছোট ছেলে একটা। তার ওপর মায়ের হম্বি-তম্বি ধমক-ধামক পর্যন্ত চলে। অবশ্য বাবা যখন সহস্রমুণ্ডীর আসনে বসে একেবারে পাথর হয়ে থাকে, তখন ওই মাটি কিছু বলে না, কোনরকম ব্যাঘাত ঘটায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে, কখনো কখনো আবার আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। যোগিনীর তখন যেন এক ভয়ংকর রকমের স্তব্ধ রূপ। কিন্তু বাবা যখন ধ্যানমগ্ন নয়, তখনই মায়ের ইচ্ছে মতো সেবাশাসন চলে তার ওপর। খাবার সাজিয়ে তাকে টেনে এনে খেতে বসায়, এক এক রাতে হিড়হিড় করে কুটীরে টেনে খড়ের বিছানায় শুইয়ে দেয়। যা মুখে আসে তাই বলে বকাবকি করে।

কিন্তু বাবা সেই বরাবরকার মতো শান্ত প্রসন্ন নির্লিপ্ত।

...শ্রী মুখোপাধ্যায় বামাসাধিকাকে এই মহাশ্মশানে প্রথম পদার্পণের পরেও দেখেছেন আবার বছর পাঁচেক বাদেও দেখেছেন। আর তার মাঝেও বার কয়েক দেখেছেন। না তার রূপ সম্পর্কে কেউ অতিশয়োক্তি করেনি।

কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব ধারণা রমণটি অপ্রকৃতিস্থ। রাধুর সঙ্গে কথা বলে বলে ধারণার অনুকূলে তিনি কিছু রসদও সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া, সে-রকম কোনো মানসিক বিপর্যয় না ঘটলে এই বয়সের আর এই রূপের বিপদ নিয়ে আত্মীয় পরিজনের আওতা ছেড়ে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। প্রথম যখন দেখেছিলেন তাকে, তখন বছর চব্বিশ বয়েস মনে হয়েছিল। অর্থাৎ নতুন বাবার থেকেও বছর চারেকের বড় হবে। পাঁচ বছর। বাদে সেই শীর্ণ কশ নতুন বাবার শিখা-দীপ্ত অবয়বে ভরা যৌবনের স্পষ্ট রূপান্তর দেখেছেন–যদিও তখন সে আগের থেকেও কঠিন তপোনিবিষ্ট, আগের থেকেও বেশি শান্ত প্রসন্ন নির্লিপ্ত। কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অবাক লেগেছিল পাঁচ বছর বাদেও সেই রূপসী সাধিকাকে দেখে। তার যেন একটা দিনও বয়স বাড়েনি, সেই জ্বলন্ত যৌবন কি-যেন এক জাদুর শেকলে বাঁধা পড়ে গেছে। বরং চোখের বিভ্রম কিনা শ্রী মুখোপাধ্যায়। জানেন না, পাঁচ বছর বাদে বামাসাধিকাকে যেন ওই নতুন বাবার থেকেও বয়সে ছোট মনে হয়েছে একটু। আর শ্রী মুখোপাধ্যায় আমাকে বলেছেন, সাধিকার স্থির রূপই দেখেছেন বটে তিনি–কিন্তু তার ধারণা সেই রূপ ভয়ংকর অস্থির হয়ে উঠতে পারে, আর তার আলো করা রূপের শিখাই দেখেছেন বটে তিনি–তবু মনে হয়েছে ওই শিখা কখনো বুঝি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেও পারে। অবশ্য, গোড়া থেকেই রমণীটিকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ধরে নিয়েছিলেন বলেই এই গোছের ধারণা তার মনে আসাটা বিচিত্র নয়, এ-কথাও স্বীকার করেছেন।

.

লোকটা বাইরের কাঁচা মাটির দাওয়ার একটা কাঠের থামে ঠেস দিয়ে বসেছিল। খালি গা, কুচকুচে কালো রঙ, পরনে হাঁটুর ওপর তোলা বিবর্ণ খাটো ধুতি। মাথার ঝাকড়া চুল এখনো কালো দিক ঘেঁষা। তেলজলের অভাবে লালচে দেখাচ্ছিল। দাড়ির বোঝা গাল বেয়ে বুকে এসে ঠেকেছে। সেই দাড়ি অবশ্য কাঁচা পাকার মিশেল! সোজা হয়ে বসে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো যখন, দেখলাম চুল-দাড়িতে একাকার মূর্তি একখানা।

www.bengaliebook.com

বললাম, একটু জল খাওয়াতে পারো রাধু, অনেক পথ রোদে হেঁটে বড় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

পরিচিতের মতো নাম ধরে কথা বলতে শুনে ও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক। ছোট চোখ, কিন্তু লক্ষ্য করলাম চাউনিতে যেন জরার ছোঁয়া লাগেনি, খুব বেশি।

কোন কথা না বলে উঠল। বিশাল একটা কাঠামোয় প্রাণবস্তু সক্রিয় হতে সময়। লাগল একটু। দাঁড়াবার পর বোঝা গেল দাওয়ায় ঝুঁকে বসেছিল না, ওর ওই অতবড় দেহটাই সামনের দিকে বেঁকে গেছে একটু। বয়সের ভারে আর হয়তো বা অনশনে অর্ধাশনে মোটা মোটা হাড়ের ওপর কালো চামড়া ঝুলে পড়েছে।

এগোতে গিয়েও দাঁড়াল আবার। বলল, আমি জেতে চণ্ডাল

ঝোলাটা কাঁধ থেকে নামাতে নামাতে আমি দাওয়ার ওপর বসে পড়লাম। হেসে বললাম, তুমি মহাশ্মশানের শ্মশানবন্ধু, তোমার আবার জাত কি গো! জল দাও, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেল।

ও তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল। একটু বাদে ওর গায়ের রঙের মতই একটা কুচকুচে কালো পাথরের গেলাসে জল আর শালপাতায় একটা বড় বাতাসা এনে সামনে। রাখল। কোথাকার জল, কি জল, খাওয়া উচিত কিনা পথে বেরুলে এ-সব নিয়ে আমার খুঁতখুঁতুনি নেই। কালো পাথরের গেলাস হাতে নিয়ে খুশি মুখে বললাম, বাঃ, তুমি পাথরের গেলাসে জল খাও নাকি, কোথায় পেলে?

-আমি খাই না, ওটা ঘরে ছেল। বলতে বলতে শতখানেক গজ দূরের ওই দুটো কুটিরের ধ্বংসাবশেষের দিকে দৃষ্টি ঘুরে গেল ওর। আমার মনে হল, কয়েক নিমেষের জন্য বিমনাও হয়ে গেল। তারপর চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে আমার দিকে তাকালো আবার।-জল খেয়ে নাও, কোথা পেলাম উ খোঁজে কাজ কি?

জল, বাতাসা খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।-তুমি বোসো রাধু, দাঁড়িয়ে কেন?

আমার মুখের ওপর ওর ঘোট ঘোট চোখ দুটো নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল। ওই থামে ঠেস দিয়েই মুখোমুখি বসল আবার।আমার নাম তোমাকে কে বলে দেল?

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের নাম বলে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, চিনলে?

ও চুল-দাড়ি বোঝাই মাথা নাড়ল। চিনল না।

গাঁয়ের নাম করতেও চিনল না, চেহারার বর্ণনা দিতেও না। হঠাৎ ওকে একটা বেপরোয়া ধাক্কা দেবার মতলব এলো আমার। বললাম, তোমার কাছে সে প্রায়ই আসতো গো, তুমি তাকে খুব মান্যি করতে, তার কাছে সেই নতুন বাবা আর বামাসাধিকার গল্প করতে–আর তাকেই শুধু একদিন তোমার মুন্নির কথা বলেছিলে, জিজ্ঞেস করেছিলে, মুন্নিকে এখন কোথায় পাই?…মনে পড়ছে?

দুচোখের জরা ঠেলে ঠেলে ও আমাকে দেখতে লাগল। সন্দিগ্ধ, কুটিল চাউনি। স্পষ্টই বোঝা গেল শ্রী মুখোপাধ্যায়কে এবারে চিনেছে। কিন্তু ওই কালো মুখ সদয় নয় একটুও।-তুমি উ ঠাকুরের ছাওয়ালি বটে?

–ছেলে নয়, ছেলের মতো, আর ছেলের থেকেও বেশি। কলকাতায় থাকি, ওঁর কাছে এসেছি। তোমার গল্প শুনে তোমাকে না দেখে থাকা গেল না–

ছোট ছোট দুই চোখ চিকচিক করছে, কিছুটা বিস্ময়ে সংশয়ে।

-তুমি এত পথ আলে আমাকে দেখতে?

হাসিমুখে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মাথা নাড়লাম। কিন্তু রাধুর মুখভাব ক্রমে যেন বিরক্তিতে ছেয়ে যেতে থাকল। ও যেন বুঝেছে আমি ওর শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছি।

www.bengaliebook.com

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বয়স কত হল রাধু?

বিড়বিড় করে জবাব দিল, কে জানে, দুতিন কুড়ি হবে–

আমার হাসি পেয়ে গেল, দু কুড়ি আর তিন কুড়ি ওর কাছে কাছাকাছি ব্যাপার। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের থেকে কিছু ছোট হলেও ওর বয়েস সাড়ে তিন কুড়ি অর্থাৎ সত্তরের কম নয়।—-

আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ও দূরের ধান ক্ষেতের দিকে চেয়ে রইল। মনে মনে। ও আমাকে এখন বিদেয় করতেই চাইছে। আমি নাছোড়বান্দার মতো বললাম, এতদূর থেকে এলাম তোমাকে দেখতে, তোমার কথা শুনতে, আর তুমি মুখ ফিরিয়ে রইলে?

-দেখা তো হল…

–কিন্তু কথা তো হল না!

আবার সেই বিরক্তি, আর চোখের তারায় সংশয়।–আমি কি ভদ্দরলোক যে তোমার সঙতে হুড়হুড় করে কথাটি কব

জবাব দিলাম, ভদ্রলোকের কথা শুনতে হলে তো সেখানেই যেতাম, এই রোদে। এত পথ তেতেপুড়ে তোমার কাছে আসব কেন?

এবারে গলার স্বরও কর্কশ ওর।-তুমি কে বটে? ইভেনে কেন আসলে?

আমিও গলার স্বর একটু চড়িয়ে জবাব দিলাম, এক্ষুণি তো শুনলে কেআর কেন এসেছি সেটা না বুঝলে তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

ছোট ছোট দুচোখ পাকিয়ে ও চেয়ে রইল। ওর চোখে চোখ রেখে আমি একটু জোরেই হেসে বললাম, দেখো রাধু, মুখুজ্জেমশাইকে মানে সেই ঠাকুরকে তুমি চেলা কাঠ নিয়ে তাড়া করেছিলে শুনেছি, কিন্তু তুমি রাগই করো আর যাই করো এখন। তোমার সে-বয়েস আছে না সেই জোর আছে?

www.bengaliebook.com

নেই যে, সেই খেদও ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে। তাই গলার সুর নরম করে বললাম, তবে সত্যিই যদি তুমি মনে ব্যথা পাও তো সে আলাদা কথা, বলো–চলে যাই।... কিন্তু সত্যিই বড় লোভ নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম রাধু ভৃঙ্গী, ভেবেছিলাম। এখন তো তোমারও বয়েস হয়েছে, মনের কথা মনের মধ্যে পুষে রেখে কত কাল। ধরে একটা যন্ত্রণা ভোগ করছ–কিন্তু এখন এ-বয়সে তোমার আর লজ্জা-ভয় নেই, রাগ-ঘৃণা নেই–এখন তুমিই হয়তো সব কথা বলে ওই যন্ত্রণা হাল্কা করার জন্য কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। আমি তোমার সেই লোক হতে এসেছিলাম রাধু ভুঙ্গী...এখন দেখছি। ওই যন্ত্রণা বুকে চেপে মরে ভূত হয়ে এখানেই তুমি ঘুরঘুর করবে।

না, এবারে আর রাগ নয়, বিরক্তি নয়, কি একটা ভয় যেন জমাট বাঁধতে থাকল ওর ওই ছোট ছোট চোখে। একটু বাদে বিড়বিড় করে শুধালো, বুক হাল্কা না হলে মুক্তি হয় না বাবু?

ওর ভয় দেখে কেন যেন আমার কষ্ট হল। ও-রকম না বললেই ভালো হত যেন। অভয় দেবার মতো করেই জবাব দিলাম, ও একটা কথার কথা বললাম, কি করে মুক্তি হয় আমিই কি জানি?...তবে শেষ বয়সে লোকে সব কিছুর মায়া কাটিয়ে হাল্কা হতে চেষ্টা করে শুনি, তোমারই বা আর কিসের সংকোচ। তাছাড়া এত বছর ধরে এভাবে কাটিয়ে তুমি তো একটা খাঁটি মানুষ হয়েই গেছ-কজন পারে এতকাল এ-ভাবে কাটাতে।

বুড়ো রাধু ভৃঙ্গী যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দাড়ি ভরতি থুতনিটা ঘষতে লাগল। ও যেন অনেক দূরের কিছু দেখছে আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। বলল, না গো বাবু, আমি একটো শয়তান আমি একটা ডাকু...বাবার আসনে আর কেউ বসল না, মুক্তির লেগে আমি শুধু বসেই থাকলাম...কেউ আসল না রে বাবু।

-ওই বসে থেকে থেকেই তোমার মুক্তি হয়ে গেছে রাধু, ভগবানের মতো মানুষ না থাকুক, ভগবান তো আছেন–তিনিই তো সব দেখলেন সব বুঝলেন, মানুষ না-ই বা এলো!

কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করল। নির্বোধ অথচ ব্যাকুল চাউনি। শেষে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তুক উ আসনের তাহলে কি হবে?

সান্ত্বনা দেবার মতো করে জবাব দিলাম, সময় হলে ভগবান পাঠাবেন কাউকে, বেঁচে যদি থাকি তখন না হয় তাকে এসে তোমার কথা বলে যাব…একটা লোক কতকাল ওই আসনের মালিকের আশায় শ্মশান আগলে বসেছিল সেই কথা–

নিজেই হেসে ফেললাম। ওরও কালো বিমর্ষ মুখে এবারে যেন একটু হাসির আভাস দেখা গেল। মন্তব্য করল তুমি বেশ লোক বাবু…।

খানিকক্ষণের জন্য আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে এলাম। এখানে ওর খাওয়া-দাওয়া সংগ্রহ কোথা থেকে, খাবার জল পায় কোথায়, বর্ষার সময় জায়গাটার কি অবস্থা দাঁড়ায়, দারুণ শীতের সময়েই বা এই খোলা জায়গায় কি করে কাটা, গাঁয়ের লোকালয়ে কখনো যায় কিনা, ইত্যাদি খুঁটিনাটি ব্যাপারে দস্তুরমতো আগ্রহ দেখালাম।

রাধু ভৃঙ্গী টুকটাক জবাব দিতে লাগল। এই আলাপের মধ্যেই ও যেন এক একটু করে সহজ হতে লাগল।

আলাপের মোড় ফিরিয়ে উৎসুক আগ্রহে প্রায় আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসলাম, আচ্ছা রাধু, মুখুজ্জেমশায়ের কাছে শুনেছি তোমাদের সেই বামাসাধিকার নাকি এমন রূপ ছিল যে চোখ ফেরানো যেত না, সত্যি নাকি?

ওর দুচোখ যেন আমার মুখের ওপর হোঁচট খেল একপ্রস্থ। কুতকুত করে চেয়ে রইল, কিন্তু আগের মতো বিরক্ত নয়।

-দেখো রাধু, এখন তুমি দিব্যি বুড়ো হয়েছে, আর তোমাদের সেই সাধিকা মা বেঁচে থাকলেও এতদিনে সে থুথুড়ি বুড়ি হয়ে যেত–আর হেসে হেসে নাতি বয়সী ছেলেদের কাছে নিজেই হয়তো নিজের রূপের কথা গল্প করত। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনো যেন তুমি তোমার সেই বয়সের মধ্যেই আটকে আছ।

শুনল মন দিয়ে, মাথা নেড়ে সায় দিল।তাই হইছে গো বাবু, ওই কালের মধ্যেই আটকে গেলম, তুমি আমাকে টেনে বার করতে লেগেছ…।

টেনে বার করছি সেটা যেন ওর মন্দ লাগছে না এখন। আমার সাগ্রহ প্রতীক্ষাটুকু ও ঠিকই অনুভব করল বোধহয়। আস্তে আস্তে জবাব দিল, সে কেমন রূপ তুমি ভাবতে পারবে না গো বাবু…দূরে নদীর ধারে যখন চিতা জ্বলত আমি মায়ের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে দেখতম, আমার চোখে মায়ের রূপের আগ চিতার আগুনের পানা লাগত, কিন্তুক চিতার আগুনের মতো গিলতে আসত না–হেসে হেসে মা সেই আগুন যেন জলে ভিজিয়ে দেত গো বাবু!

ওর বক্তব্য বোঝা গেল। উপমাটুকু অদ্‌ভুত ভালো লাগল কানে। হাসিভেজানে রূপের আগুনের উপমা আর কখনো শুনিনি।

দ্বিধা কাটিয়ে পাপ কবুল করার মতো করেই একটু বাদে রাধু ভৃঙ্গী আবার বলল, আমি একটো শয়তান দুশমন ছিলম…খুব খারাপ ছিলম…খুব খারাপ ছিলম, উ মায়ের দিকে আমার চোখ লাগত, কামি ভুলতম, দিশা ফিরলে তখন শয়তানের টুটি ছিঁড়তে লাগতম আর নিজের চোখ তুলে আনার জন্যি ঘরপানে ছুটে যেতম…কিন্তুক চোখ গেলে মা-কে দেখতি পাবনি, বাবার সেবা করতে পারনি, তখুন তো জেবন যাবে! শেষে কেবল মা-মা মা-মা করতে লাগলম, আর মায়ের কাছে আলে ছোট বাচ্চার পানা কেবল মা-মা মা-মা করতম!

আমি কান পেতে শুনছি। সর্বক্ষণ কথায় কথায় ওই মা-মা শুনে সাধিকা নাকি এক-একসময় রেগে গিয়ে ভেঙচি কাটত, বলত, কেবল মা-মা করে কান ঝালাপালা করিস কেন, মা-কি তোর মরেছে–সামনে দেখতে পাচ্ছিস না!

ওর মুখ দেখে নাকি সেই রাগের মুখেই আবার হাসি ঝরত। বলত, কি বরাত আমার, সব খুইয়ে শেষে কিনা এক চণ্ডাল ছেলে…!

রাধুর মোট বক্তব্য, মায়ের এমনই রূপ যে বহুদিন কেবল মা-মা করে বিবেকের চাবুক হেনে তবে তার পাপ চক্ষু ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। অথচ প্রথম দেখার দিন। থেকেই ওই মা-কে সে যেমন ভয় করত তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধা করত।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের ভয়ে সেদিন আর দেরি না করে উঠে পড়তে হয়েছে। এরপর হয়তো শ্মশানেই লোক পাঠিয়ে বসবেন তিনি। রাধুকে বলেছি, কাল আবার আসব।

আপত্তি তো করেইনি, মুখে যেন একটু নীরব আগ্রহ দেখেছিলাম ওর। পরদিন এসেছি। তার পরের দিনও। কাঁধের ঝোলাতে ওর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলাম। সেগুলো দেখে খুশি যেন ওর মুখ বেয়ে দাড়ি চুঁইয়ে পড়েছে। কতকাল ও ভালো খাবার চোখেও দেখেনি মনে হতে ভিতরটা আমার কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় দিন আরো বেশি খাবারের সঙ্গে চাল-ডাল তরি-তরিকারিও এনেছিলাম। একটা মুটের মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে। সেই সব দেখে তো ওর ছোট চোখ জোড়া গোল একেবারে। পয়সা দিয়ে মুটে বিদেয় করে দেখি ওর সেই চোখে জল টলটল করছে। হাত ধরে আমাকে দাওয়ায় বসিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, তুমি কেতো ভালো। গো বাবু, কেতো ভালো…

বললাম, থাম তো বাপু, তুমি নিজে যে কতো ভালো তুমি নিজেও জানে না।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা যেন বিগড়ে গেল। ছোট চোখ ঘোরালো করে তাকালো আমার দিকে। তারপর ধমকেই উঠল যেন, তোমাকে বললম না আমি ভালো না–আমি শয়তান আমি দুশমন–উ এক কথা আর কেতো বার বলব?

-আচ্ছা বাবা হয়েছে, আমার তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা, অমন শয়তান একটা করে সকলের মধ্যেই থাকে সে তুমি না বুঝলে আর কি করা যাবে!

সঙ্গে সঙ্গে ওই তপ্ত কালো মুখই বিষণ্ণ আবার। আমার ওপর ও-ভাবে ঝাঁঝিয়ে ওঠার দরুন হতে পারে আবার কোনো স্মৃতির দংশনের জন্যেও

হতে পারে। একটু বাদে ঝাকড়া চুল-দাড়ি বোঝাই মাথা-মুখ ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে ক্লান্ত সুরে বলল, না গো বাবু না, তুমি জানো না আমি খুব খারাপ দুশমন…আমার লেগেই মহাশ্মশান খালি হইন গেল, আমার লেগে উ হামার মুণ্ডীর আসন খালি হই গেল, আর আমার লেগে মা সবকুছুতে আগ লাগায়ে দেল

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছি। যে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, বুঝতে পারলে ওই বৃদ্ধের বুকে নতুন করে আঘাত পড়বে একটা জেনেও সেই মুহূর্তে অন্তত অকরুণ। আমি–তুমি ঠিক বলছ যা হয়েছে সব তোমার জন্যে? আর কানো কারণ নেই? তুমি তোমার ওই মায়ের নামে শপথ করে বলতে পারো?

রাধু ভৃঙ্গী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। আচমকা এই প্রশ্নটা বোধের অতীত যেন।

আরো স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার জন্যে সব গেছে, সব নষ্ট হয়েছে –সেটা তোমার ঢের ঢের পরের চিন্তা, নাকি সেই ভয়ংকর দিনেও তোমার এই কথাই মনে হয়েছিল, এই অনুশোচনা হয়েছিল?

এবার যেন একটু অস্বস্তিবোধ করছে ও। আমি কিন্তু তেমনিই অকরুণ।–তোমার জন্যেই যদি সব নষ্ট হয়ে থাকে তো সেই দিন ওই অশ্বত্থ গাছের দিকে চেয়ে কেবল গলা ফাটিয়ে হেসেই চলেছিলে কেন? আর কেন তারপর তোমার মুন্নির জন্যে হাহাকার করে উঠেছিলে?

রাধু ভৃঙ্গী স্থাণুর মতো বসে! অসহায় দৃষ্টি। দীর্ঘ দিনের একটা শোক আর অনুশোচনার আশ্রয় থেকেও যেন ওকে টেনে বার করে আনা হল।

আবার সেই একই প্রশ্ন করলাম আমি, এবারে ভেবে বলো–যা হয়েছে সব তোমার জন্যেই হয়েছে? আর কোনো কারণ নেই? এ-কথা তুমি তোমার ওই মায়ের নামে শপথ করে বলতে পারো?

অনেকক্ষণ বাদে রাধু ভৃঙ্গী আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে। বলতে পারে না। মর্মছেঁড়া সত্যি কবুল করার মতো করে যা বলল তার সারমর্ম, ওই নয়া বাবার ওপর বামাসাধিকা প্রতিশোধ নিয়েছে, পুরনো হিংসার মোকাবিলা করেছে..রাধু সেটা আগে বুঝতে পারেনি, সব শেষ হয়ে যাবার পরে বুঝেছে। কিন্তু তবু সব কিছুর জন্য রাধু নিজেকে দায়ী করে কারণ সমস্ত সর্বনাশের সে উপলক্ষ–ওর আর মুন্নির জন্যই শেষ পর্যন্ত সাধিকার শিরার রক্তে পুরনো হিংসার আগুন জ্বলল…নইলে সাধিকা সেটা ভুলতে চেষ্টা করেছিল, ভুলতে চেয়েছিল, নয়া বাবার সেবা করে হিংসা ক্ষয় করতে চেয়েছিল, ক্ষয় করছিল।

.

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা কাহিনীর কাঠামোর সঙ্গে এবারে মিলছে। প্রতিশোধের নেশা কেমন করে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে সেই আলোচনার প্রসঙ্গ থেকেই তাঁর এই কাহিনীর সূত্রপাত। কাহিনীটা নিজের কাছেই অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল শ্রী মুখোপাধ্যায়ের। কারণ সেখানে রাধু ভৃঙ্গীর ভূমিকাটি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু রোমহর্ষক সেই সংঘাতে রাধুর সেই ভূমিকা প্রায় অবিচ্ছেদ্য বলা যেতে পারে।

…রাধু ভৃঙ্গীকে যুক্ত করে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর চিত্রটি এবারে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে।

…মহাশ্মশানের সেই মুখর দিনে নতুন বাবা আশপাশের দশ গাঁয়ের মানুষের হৃদয় মন জয় করে বসেছিল বললেও বেশি বলা হবে না। ওই বয়সের অমন নির্লোভ স্থিতধী তাপস আর বুঝি দেখেনি কেউ। আর এক বছর যেতে অমন তাপসের কিনা গার্জেন হয়ে বসল বামাসাধিকা। তার কি শক্তি কম? গাঁয়ের মানুষেরা আদ্যাশক্তির জাগ্রত অংশ ভাবত তাকে। সব থেকে বেশি ভাবত রাধু নিজে।

শ্মশানগত ভক্তদের কাছে বামাসাধিকা মায়ের মতই সরল তরল, অন্য দিকে অগ্নিস্তব্ধ তেজের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। রাধুর এক-একসময় মনে হত ওই মায়ের কল্যাণেই হয়ত সমস্ত দেশের মানুষ একদিন এই মহাশ্মশানে

www.bengaliebook.com

এসে নয়া বাবার পায়ে ধন্না দেবে। মায়ের এমনি তেজ এমনি আকর্ষণীয় শক্তি।

ভাবের আবেগে কথায় কথায় রাধু মা-কে একদিন সে-কথা বলেও ফেলেছিল। শুনে বামাসাধিকা হেসে বাঁচে না। বলেছিল, তোর মহাদেও বাবা তো ওই অশ্বত্থ গাছটার মতো একটা কাঠের গুঁড়ি–গাছটা তবু ডালপালা ছড়ায় ছায়া দেয়, তোর বাবার কাছে এসে ধন্না দিয়ে কে কি পাবে?

রাধু রাগ করে পাল্টা জবাব দিয়েছিল, যার ভাগ্যে আছে সে পাবে–তুমি পাচ্ছ। কি পাচ্ছ না?

ও-কথা শুনেও মায়ের সেকি হাসি। তারপর বলেছিল, আমি পেতে এসেছি তোকে কে বলল রে?

শুনে রাধু থতমত খেয়েছিল। মনে হয়েছিল সাধিকা মা হয়তো বাবাকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যেতেই এসেছে এখানে।

কিন্তু বাবাকে কাঠের গুঁড়ি বললেও তার ওপর বামাসাধিকার প্রতিপত্তি কিন্তু দিব্যি বাড়ছিল। নয়া বাবা সহস্রমুণ্ডীর আসনে সাধনায় বসে থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ অবশ্য কাঠের গুঁড়িই বসে। নিশ্চল দেহটা শুধু আসনে বসে থাকে, তিনি যে কোথায় চলে যান কে জানে। কিন্তু অন্য সময় বাবার ওপর মায়ের শাসন আর হম্বিতম্বি লেগেই আছে। বয়সে অবশ্য নয়া বাবা মায়ের থেকে চার বছরের ছোট কিন্তু অমন মহাযোগীকে কে আর বয়েস দিয়ে বিচার করে? কিন্তু মায়ের কাছে বাবা যেন ছোট্ট ছেলে একটা, যেমন করে খুশি নাড়বে-চাড়বে খাওয়াবে বসাবে ঘুম পাড়াবে। কথার অবাধ্য হলে রাগে আর তেজে বাবাকে যেন ভস্ম করে ফেলবে একেবারে। মায়ের সেই রাগ আর সেই তেজ আর সেই ধক-ধকে চাউনি দেখে রাধুর কতদিন যে হৃৎকম্প হয়েছে ঠিক নেই। আর কি নিয়ে যে মা হঠাৎ বাবার ওপর রেগে যেত রাধু বেশিরভাগ সময় তাও ঠাওর করে উঠতে পারত না।

..বাবা যখন তার আসনে ধ্যানে বসে তখন মায়ের মুখ সেলাই একেবারে। এক একদিন এমন করে চেয়ে থাকত দূরে বসে যে রাধুর অবাক লাগত।

কত দিন দেখেছে, মায়ের চোখে পলক পড়ে না, চেয়েই আছে চেয়েই আছে। সে এক অদ্‌ভুত চাউনি।

রাধু কতদিন জিজ্ঞেস করেছে, বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে তুমি কি দেখ?।

মা বেশিরভাগ দিনই হেসেছে, কিন্তু একদিন জবাব দিয়েছিল, বলেছিল, দেখে দেখে নিজের বুকের তলায় আগুন নেভাই রে-নেভাতে চেষ্টা করি কিন্তু সে কি সহজে নেভে রে!

রাধু চমকে উঠেছিল! অস্বস্তির একশেষ তারপর।...মা কোন আগুনের কথা বলছে? বাসনার আগুন? তক্ষুনি সরোষে নিজের কান মলেছে নাক মলেছে রাধু। হয়তো ভগবান দেখার বাসনা মায়ের, তাকে না দেখতে পেয়ে মায়ের বুক জ্বলছে–তাই মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখে মা জ্বালা জুড়োয়। তাই হবে, তাছাড়া আর কি হতে পারে।

একরাতে রাধুর জ্বর হয়েছিল বেশ। এই শরীরে জ্বরজ্বালা হত না বড়, তাই একটু কাহিল হয়ে পড়েছিল। ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। রাত্রিতে বামাসাধিকা এলো ওকে দেখতে। মাথায় গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। রাধুর মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ দেবী এসে। ওর জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে দিচ্ছে।

সেই উন্মাদিনী বিধবা মা তাই দেখে বীভৎসভাবে হেসে উঠল, ও বুঝেছে ওদের সক্কলকে খাব আমরা, তাই পালালো–কিন্তু যাবে কোথায়, কেউ রক্ষা পাবে না, আমাদের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই!

আসল অপরাধী যে, সে-পর্যন্ত এই দৃশ্য দেখে আর এই অভিসম্পাত শুনে ভয়ে কাঠ কয়েক মুহূর্ত। তারপর অবশ্য দরোয়ান দিয়ে ওই উন্মাদিনী আর তার ছেলের বউকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে।

সকলের বিশ্বাস, বিধবা মায়ের সেই অভিসম্পাত ওই রাত থেকেই ফলতে শুরু করেছে। কারণ, ছোট ভূস্বামীর সেই যে ধর্ম-পাগল ছেলেটা আর্তনাদ করে ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়েছিল তার সন্ধান আর মেলেনি। আসলে ছেলেটা বাড়ি থেকেই ছুটে বেরিয়ে গেছল। সমস্ত লোকের মনোযোগ সেই

উন্মাদিনী মায়ের দিকে ছিল বলে। কেউ লক্ষ্য করেনি। কদিন ধরে দশ বিশখানা গ্রাম তোলপাড় করেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পুত্রশোকাতুরা উন্মাদিনী বিধবা আর একটা দিনও সুস্থ হয়নি। যতদিন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে ফেলতে পেরেছে, ওই ভূস্বামীদের ওই এক অভিসম্পাত করে গেছে। তার পুত্রবধূ গরিব বাপের সেই রূপসী মেয়েও আধ-পাগল। কারো সঙ্গে একটি কথাও বলে না, দিবারাত্র কেবল হাতে করে নিজের কপাল মোছে। কিন্তু তার ধারণা কপাল থেকে রক্তের দাগ আর কিছুতে উঠছে না।

তিনমাস না যেতে বড় ভূস্বামীর সেই লম্পট ছেলের বাসনা এই রূপসী বউকে কেন্দ্র করে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। দিবারাত্র তাকে এই বাড়ির কাছাকাছি ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। যে বউ সমস্তক্ষণ বোবা সে শুধু ওই লম্পটকে দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে, সময় ঘনিয়েছে, কাল ঘনিয়েছে, রোসো!

অবাক কাণ্ড, সত্যিই তার কাল ঘনালো। তিনদিন আগে মাত্র পুত্রশোকাতুরা সেই উন্মাদিনী মা হৃদরোগে আচমকা চোখ বুজেছেন। ঠিক তিনদিন বাদে খুব সকালে। দেখা গেছে বড় ভূস্বামীর সেই লম্পট ছেলের মৃতদেহ দুমাইল দুরের একটা পুকুরে ভাসছে। তার দুহাত দুপা শক্ত করে বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা

অনেকেরই মনে মনে ধারণা ওই রূপসী বউয়ের স্বামীর অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাজ এটা। এই নির্মম প্রতিশোধ তারাই নিয়েছে।

আর সেই রাতের পর থেকেই ওই রূপসী বউকে গাঁয়ের মানুষ আর দেখেনি। কোনদিনও দেখেনি।

মায়ের মুখে ওই অত্যাচারের গল্প শুনেই রাধু স্তব্ধ, কারণ তার অন্তরাত্মাসুদ্ধ বলে উঠেছে এই বামাসাধিকাই সেই রূপসী বউ। সঙ্গে সঙ্গে বকের ভিতরে কাঁপুনি। তার।...ওই নয়া বাবা তাহলে কে? ছোট ভূস্বামীর সেই ছেলে–কানে মন্ত্র দিয়ে সাধু ও যাকে অকালে ধর্মপাগল করে দিয়েছিল? যত ভেবেছে রাধুর কাপুনি বেড়েছে। বামাসাধিকা প্রথমদিন

বেলা দ্বিপ্রহরে এই মহাশ্মশানে এসে যে-ভাবে দাঁড়িয়ে আসনে। সমাসীন বাবাকে দেখছিল–সেই দৃশ্য মনে পড়তেই কাঁপুনি বেড়েছিল। এমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল যে সেই প্রথম দেখা আগুন-পানা মেয়েছেলেকে পাগলই মনে হয়েছিল।...আর এখনো মা যে-ভাবে এক-একসময় বাবাকে দেখে চেয়ে চেয়ে। –তাও কেমন স্বাভাবিক মনে হয় না রাধুর।

ভয়ে ভয়ে এ-প্রসঙ্গ মায়ের কাছে আর কোনদিন তোলেনি রাধু। সে কেবলই ভাবতে চেষ্টা করেছে, আগের পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামানো মিথ্যে–তাদের নয়া বাবা মহাযোগী, আর বামাসাধিকা মহাযোগিনী।

.

বিপদের সূত্রপাত রাধুকে নিয়েই। সে নিজেই স্বীকার করেছে তার স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না। ওর দুটো নেশা ছিল। মদ আর মুন্না। কিন্তু মুন্নাকে পেলে মদের দরকার হত না। শুধু ওই মেয়ের জন্যেই নদীর ধার ছেড়ে, সগোত্রদের ছেড়ে এই দূরে এসে ডেরা বেঁধেছিল সে। মহাশ্মশানের এই নির্জনে রাত-দুপুরে বিরক্ত করতে আসবে এত বুকের পাটা ওর স্বজাতীয়দেরও নেই।

শুধু মুন্নাই আসত। একেবারে নির্ভয়ে আসত। অমন বুকের পাটাও বোধহয় কোনো মেয়েমানুষের হয়না। মুন্নার বাপ মানুষটা যেমন ক্রুর তেমনি লোভী। রাধুকে সে দুচক্ষে দেখতে পারতনা। পারবে কেন, রাধু যে কোনদিন তার হুকুমের পরোয়া করত না-সর্বদা বুক চিতিয়ে চলত। আবার ঠিক সেই কারণে মুন্না ওকে সক্কলের থেকে বেশি পছন্দ করত। ওর চোখে রাধুই একমাত্র মরদ। মুন্নার গায়ের রং সামান্য তামাটে। আর ঘাগরা পরা চৌদ্দ বছরের সেই মেয়ের পাথরে কোঁদা নিটোল স্বাস্থ্য দেখলে পুরুষগুলোর চোখে ঘোর লাগত। তার ওপর গায়ের ওই রঙের বাড়তি কদর। ....ষোল বছর বয়সে একরাশ টাকা গুনে নিয়ে বাপ ওকে চুলের ঝুঁটি ধরে একটা বদমাসের হাতে সঁপে দিল। রাধু তখন মুন্নার বাপকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল–মাতব্বরকে এভাবে অপমান করার দরুন তাবেদার স্বজাতীয়রা ওকে প্রায় বর্জনই করেছিল।

দুবছর বাদে মুন্নার শয়তান স্বামীটাকে সাপে কাটতে মুন্নার হাড়ে বাতাস লেগেছিল। ওদিকে বাপও আবার মেয়ের ওপর দখল পেয়ে খুশি। আবার কারো কাছে মেয়ে বেচে মোটা দাও মারবে।

কিন্তু মেয়েও কম নয়, বাপের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা সেই বার করল মাথা। খাঁটিয়ে। ওর ওপর প্রেত ভর করল। ভর যে করবে রাধুকে ও সেটা আগেই জানিয়ে রেখেছিল। সারাক্ষণ আলুথালু বিকট মূর্তি মুন্নার কোনো পুরুষ মানুষ কাছে আসতে চাইলেই সে তাকে মারতে ছোটে। নেচে কুঁদে একাকার কাণ্ড করে। চার পাঁচটা জোয়ান মানুষও তখন ধরে রাখতে পারে না ওকে।

মুন্নার বাপও ঘাবড়ে গেল। দুতিনটে ওঝা প্রেত ছাড়াতে এসে উল্টে নাজেহাল হয়ে ফিরে গেল। অবশ্য মুন্নারও হেনস্থা কম হলনা। ঝাটার পিটুনি খেয়ে তার সর্বাঙ্গ দাগড়া হয়ে গেল। মার খেয়ে ঝিম মেরে থাকে, আবার ফঁক পেলেই ওই গুণীনদের। টুটি কামড়ে ধরতে আসে। এক গুণীনের তো প্রাণান্ত দশাই করে ছেড়েছিল।

শেষে দূর থেকে এক বড় গুণীন এলো। বলা বাহুল্য এটা রাধুর কারসাজি। আসলে সে গুণীন-টুনিন কিছুই নয়। রাধুর মোটা টাকা খেয়ে সে গুণীন হয়ে এসেছে। রোগের ফয়েসলা করে দিলে মুন্নার বাপের কাছ থেকেও কিছু প্রাপ্তির আশা। মনের মত কাজ হলে রাধু তো প্রতিশ্রুতির টাকা কড়া-ক্রান্তিতে গুনে দেবেই।

সেই বড় গুণীন প্রথমে খুব ঘটা করেই চেষ্টা করল প্রেত ছাড়াতে। তারপর তার মুখ ভয়াল গম্ভীর। মুন্নার বাপকে কাছে ডেকে জানালো, মুন্নার স্বামীর প্রেত ভর করেছে ওর ওপর–সে-ই তার বহুকে আগলে রেখেছে। বহুর সামনে পুরুষ মানুষ দেখলেই সেই প্রেত ক্ষেপে যায়। এই মেয়েকে যে বিয়ে করবে এখন ওই প্রেত তার ঘাড় মটকাবেই। এখন একমাত্র পথ মেয়ের জন্য ডেরার কাছাকাছি একটা আলাদা ঘর তুলে দেওয়া। সেদিকে কোনো পুরুষ মানুষ ঘেঁষবে না। আর রাতে পুরুষ বা মেয়ে কেউ না। ধরে নিতে হবে মেয়ে এখনো তার স্বামীর ঘর করছে।

মুন্নার বাপ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, কতদিন এভাবে চলবে?

বড় গুণীন জবাব দিয়েছে, এক বছর কি দুবছর কি তিন বছর কেউ বলতে পারবে না। মুন্না অর্থাৎ ওই প্রেতকে যত বিরক্ত করা হবে ততো অমঙ্গল। এক সময় সে নিজে থেকেই মুন্নাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। পুরোপুরি যেদিন ছাড়বে, ওই প্রেত নিজেই তার ডেরার এক দিক ভেঙে দিয়ে চলে যাবে।

অবিশ্বাস কেউ করেনি, কারণ অবিশ্বাসের কোনো পথ মুন্না রাখেনি। মাস দেড় সে ঠাণ্ডাভাবে কাটালো, সন্ধ্যার পর কোনো পুরুষকে ঘরের কাছাকাছি দেখলে তখন। সে তার টুটি কামড়ে নিতে ছোটে। ওর বাপকেও ছেড়ে কথা কয় না।

তারপর থেকে ওদের নৈশ অভিসার ভালই চলছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাতে। অন্ধকারে মিশে মুন্না চলে যেত রাধুর ডেরায়– অনেকটা পথ, কিন্তু মুন্নার ভয় ডর কিছু ছিল না। ভোর হবার ঢের আগেই আবার ফিরে আসত। আর তখন থেকেই টাকা জমাবার চেষ্টায় মন দিয়েছে রাধু। হাতে কিছু জমলেই সকলের। চোখে ধুলো দিয়ে মুন্নাকে নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে পালাবে।

সুখেই দিন যাচ্ছিল।

..সব ওলট পালট হয়ে গেল ওই নয়া বাবা এসে এখানে সহস্রমুণ্ডীর আসন। পেতে বসতে। ওই ছোকরা সাধু যেন রাতারাতি বশ করে ফেলল ওকে। নিজের চোখে রাধু নয়া বাবার এমন সব তাজ্জব কাণ্ড দেখল যে মুন্না গোপনে তার ডেরায়। এলে ওর কাপুনি ধরে। মুন্নার আসাই একরকম বন্ধ করে দিল রাধু। ফলে মুন্না আবার। নয়া বাবার ওপর বিরূপ।

ওকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যেও বটে আবার প্রবৃত্তির তাড়নায়ও বটে, এর থেকে ব্যবস্থাটা উল্টে গেল। সুযোগ পেলেই রাধুই রাতের আঁধারে মুন্নার ডেরায় যায়। না, ভয় ডর তখন ওরও লেশমাত্র নেই। অতবড় বাবার চেলা হয়ে বসেছে, ও ভয় করবে কাকে? ভয় একমাত্র ওই নয়া বাবাকেই। গোড়ায়

গোড়ায় মুন্নার ডেরা থেকে রাতের শেষ প্রহরে বা তার আগেই কাঁপতে কাঁপতে ফিরত। কিন্তু ভয়টা ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগল। মুন্নাকেও অন্যরকম আশ্বাস দেবার সুযোগ মিলল, ভক্তদের কাছ্ থেকে টাকা-পয়সা খাবার-দাবারের ভেট যা আসে নয়া বাবা তো সেদিকে ফিরেও তাকায় না। অতএব টাকা আরো অনেক আগেই জমবে, আর ওদেরও পালানোর। সুবিধে হবে। মুন্নার জন্য ভালো ভালো খাবারও সঙ্গে নিয়ে যায় সে।

…কিন্তু মুন্নার প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও এখান থেকে বাবাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছেটা যে ক্রমেই কমে আসছে, সে-কথা ওকে মুখ ফুটে বলতে পারে না।

দ্বিতীয় দফা গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়ে গেল মহাশ্মশানে বামাসাধিকার পদার্পণের পর। সেই সঙ্গে রাধুর ভিতরটারও আর এক প্রস্থ ওলট পালট। মুন্নার কাছে যাওয়ার সুযোগ এর আগে থেকে কমে গেল। প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়না যখন অসহ্য মনে হয় তখনি শুধু চোরের মতো চুপিচুপি যায়। কিন্তু এরই ফলে আবার মুন্নার সঙ্গে খটাখটি লাগে, ঝগড়া-ঝাটি হয়ে যায়। বেশি রাগলে মুন্না শাসায় ও-ই যাবে রাধুর ডেরায়, নয়া বাবা কেমন করে ওকে ঠেকাতে পারে দেখে নেবে!

ভয়ে ত্রাসে রাধু ওকে তখন কত ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে ঠিক নেই। ত্রাসের কারণও আছে, ইদানীং ও বাইরে রাত কাটালেই ঠিক ঠিক যেন বুঝতে পারে। এমন করে তাকায় তার দিকে যে রাধুর বুকের তলায় কম্প শুরু হয়। ও মনে মনে নাক কান মলে, আর কক্ষনো অমন কাজ করবে না–চুলোয় যাক মুন্না।

…আশ্চর্য, নয়া বাবা আর সেই সঙ্গে বামাসাধিকা ওকে যেমন বশ করেছে, তেমনি মুন্নার প্রতি টানটাও কিছুতে যেন ছেড়বার নয়। সেই অন্ধ তাড়না যখন ওকে পেয়ে বসে, তখন সব ভুল হয়ে যায়। নেশাগ্রস্তের মতই ও তখন না গিয়ে পারে না। ওদিকে মুন্নাও তেড়ে আসে, ওকে তাড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাড়িয়ে দেয় না–বরং লোকটাকে দ্বিগুণ বশ করার নেশায় সে-ও ভিতরে ভিতরে ঝলসে ওঠে।

www.bengaliebook.com

দুদিক থেকেই রাধুর নিগ্রহ বাড়তে থাকে। বাবা ঠিক টের পায়। তার ভ্রূকুটি আরো ভয়াল হয়। এক-একদিন এমন করে তাকায় যেন ভস্ম করে ফেলবে ওকে। তখন আবার মুন্নাকেই খুন করতে ইচ্ছে যায় রাধুর।

ব্যাপারটা মা জেনে ফেলার পর প্রথম দিনকতক খুব ভয়ে ভয়ে ছিল রাধু। কিন্তু বিপদ কিছু ঘটল না। তবু কিছুকাল নিজেকে সংযমের শেকলে বেঁধে রাখল রাধু। বেশি যাতনা শুরু হলে ডবল মদ খেয়ে জ্বালা জুড়োয়।...আশ্চর্য এই নেশা করলে নয়া বাবা কিন্তু ভ্রুক্ষেপও করে না।

...কিন্তু রাধু অসহায়, একবার প্রবৃত্তির দাস হলে তার বুঝি আর অব্যাহতি নেই। আবারও গেছে মুন্নার কাছে। অনেক দিন পরে গেছে। মুন্না ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে আবার কেঁদেও ভাসিয়েছে। আগে আর কখনো কাঁদেনি মুন্না।

পরদিন নয়া বাবার সামনে আসতেই বাবা আঙ্গুলের ইশারায় ওকে সামনে থেকে চলে যেতে হুকুম করেছে। বামাসাধিকা তখন বাবার সামনে বসে। সে-ও গম্ভার। চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে রাধু সরে এসেছে।

বিকেলে বাবার সামনে মা-ই ওকে ডেকে পাঠালো। কাছে যেতে ধমকে উঠল, বলি কোথায় মরে পড়েছিলি সমস্ত দিন-কাঠ নেই, বলি এ-সব কি আমি বয়ে নিয়ে আসব!

রাধু পড়িমরি করে ছুটেছে সব সংগ্রহ করতে। কিন্তু আশ্চর্য, নিয়ে এসে দেখে কাঠ ধুনো সবই আছে–আর মায়েরও খুশি-খুশি মুখ।

সেই থেকে রাধু বুঝে নিয়েছে মায়ের অন্তত ওর ওপর রাগের লেশমাত্র নেই। আর পরে ক্রমশ এও অনুভব করেছে, ওকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে নয়া বাবার ঝগড়াঝাটিও হয় মাঝে মাঝে। ঝগড়ার হেতু যে মুন্না তাতে আর সন্দেহ কি!

..সেদিন রাতের শেষ যামে মুন্নার ডেরা থেকে ফিরে রাধু সকালে আর নয়া বাবার আসনের দিকে যায়নি। ভয়ে ভয়ে নিজের ডেরাতেই বসে আছে। এ-রকম। আরো দুই একবার হয়েছে। পরে নয়া বাবার আর সে-রকম চাউনি

দেখেনি। ওর ধারণা মা-ই নয়া বাবার মাথা ঠাণ্ডা করে ওর ফাড়া কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এবারে আর তা হল না। একটু বেলা হতে মা এলো। গগনে মুখ। ঝাঁঝিয়ে বলল, তোর নয়া বাবা যে এখান থেকে তাড়াবেই তোকে ঠিক করেছে সে খেয়াল আছে? এবারে যেখানে খুশি গিয়ে মর গে যা, আমি আর কিছুতে নেই।

সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি রাধুর চোখের সামনে বনবন করে ঘুরে গেল। অন্ধকার দেখছে। মা ঝলমল পা ফেলে চলে যাচ্ছে।

রাধু ছুটে গিয়ে তার দুটো পা আঁকড়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

–ছাড়! ছাড় বলছি, পাজি হতচ্ছাড়া! চুলোয় যা, চুলোয় যা।

রাধু পা আঁকড়ে ধরে পড়েই রইল। নিশ্চল মুহূর্ত গোটাকতক।

-পা ছাড়। এই কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আলাদা। রাধু পা ছেড়ে উঠে বসল।

-যা, ঘরে যা। বিকেলে আসিস।

.

ছমাস কেটেছে তারপর। রাধুর সংযমে চিড় খায়নি আর। প্রবৃত্তির সেই অন্ধ আবেগের পাল্লায় পড়ার আগেই মদে ডুবেছে। বাবার বিরূপভাজন আর সে হবে না–তার আগে শরীরের ক্ষুধা টুটি টিপে শেষ করবে ও। ভিতরটা এখনো ছটফট করে এক একসময়। তখন সক্কলের ওপর রাগ হয়–নিজের ওপরে, মুন্নার ওপরে, মায়ের ওপর, ওই নয়া বাবার ওপর–দুনিয়ার সক্কলের ওপর। মদে চুর হয়ে হয়ে ফাড়াকেটে যাবার পর মুখে হাসি ফোটে, নিজের ওপর আস্থা ফেরে।

..তারপর সেই এক ভয়াল রাত। প্রথম প্রহর হবে সেটা। মহাশ্মশান নিস্তব্ধ। নয়া বাবা কালীমন্দিরের সামনে বসে। অদূরে মা-ও বসে। তার হাত তিনেক দূরে রাধুও বসে ঝিমুচ্ছে।

হঠাৎ আঁতকে উঠল সে। ঠিক দেখছে কি স্বপ্ন দেখছে ভেবে না পেয়ে দুচোখ রগড়ে নিল। যা দেখছে সত্যি, না রাধুর মাথা খারাপ হয়ে গেল? ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে তাকালো, তারপর মায়ের দিকে। তারাও অবাক বিস্ময়ে একই দৃশ্য দেখছে।

কোমরে দুহাত তুলে বাবার ঠিক দশ গজ দূরে মুন্না দাঁড়িয়ে আছে। দৃপ্ত উদ্ধত ফণা তুলে শত্রুকে দেখছে যেন সাপিনী। বাবাকেই দেখছে, বাবার দিকেই চেয়ে আছে, দুচোখ জ্বলছে।

রাধু নির্বাক, বিমূঢ়। গলা কাঠ, জ্ঞান বিলুপ্ত যেন।

তেমনি জ্বলন্ত চোখে একবার সকলকেই দেখে নিল মুন্না। তারপর বাবার দিকে ফিরল আবার। হিসহিস করে বলল, তুমি এখানে এসেছ কেন? পাহাড়ে যাও, জঙ্গলে যাও! এখানে এসে মেয়ে মানুষের মরদ কেড়েছ- তোমার পুণ্যি হবে? তোমার পাপ লাগবে না?

ওরা তিনজন তেমনি নির্বাক, তেমনি নিশ্চল।

যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি আচমকা অন্ধকারে মিশে গেল মুন্না। একটা অদ্ভুত মোহ ভেঙে সজাগ হল যেন রাধু ভৃঙ্গী।

থমথমে মুখে নয়া বাবা উঠে নিজের কুটীরের দিকে চলে গেল।

মায়ের মুখভাব এখন শান্ত, নির্লিপ্ত।

রাধু উঠল। ক্লান্ত শরীরটা টেনে হিঁচড়ে ডেরার দিকে নিয়ে চলল। ঘরের কাছাকাছি এসে হুশ ফিরল আবার। ঘরে কুপী জ্বলছে।...আশ্চর্য, এ-রকম ভুল ওর বড় একটা হয় না। কুপী জ্বেলেই চলে গেছল।

ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ু লণ্ডভণ্ড করে দেবার মতই বিষম চমক আবার। সামনে মুন্না দাঁড়িয়ে। দুহাত কোমরে তেমনি। কিন্তু হাসছে এখন। ওর চোখ হাসছে, মুখ হাসছে, সর্ব অঙ্গে হাসির বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে

যেন। হাসির দমকে ওর ভরা। বুক ফুলেফুলে উঠছে, সাদা দাঁত ঝকমক করছে।

...রাধু কি ওই অমোঘ ইচ্ছার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে না হাতের কাছে কিছু একটা। ধরে ভেসে ওঠার শেষ চেষ্টা করছে?...হাতে ঠেকল কিছু। শেয়াল আর শুয়োর তাড়ানোর ডাণ্ডা।

তারপর কি হলো রাধু জানে না।

তীব্র তীক্ষ্ণ সত্তা থেঁতলানো আর্তনাদে শ্মশানের স্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে। বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলছুটন্ত আর্তনাদ-নাড়ি-ছেঁড়া আর্তনাদ করতে করতে মরণ-ছোটা ছুটছে।

স্থাণুর মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল রাধু জানে না। ঘরে এসে আবার কে দাঁড়াল। বামাসাধিকা। ঘোলাটে চোখে রাধু তাকালো তার দিকে।

সামনের লোহার ডাণ্ডাটা দেখল বামাসাধিকা। শিউরে উঠল একবার। এভাবে মারলি? এ-ভাবে মেরে শেষ করলি?

ঘোলাটে চোখে রাধু চেয়েই আছে।

কিন্তু কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে আবার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল যেন রাধু। ...মায়ের এ-কি চোখ, এ-কি মুখ? সমস্ত মুখ দিয়ে আগুন ছুটছে, দুটো চোখ যেন। জ্বলন্ত কয়লা। শুধু মুখ নয়–মায়ের সমস্ত দেহখানাই যেন ধকধক করে জ্বলছে।

...ভেবেছিলাম ক্ষমা করেছি, ক্ষমা করব...ক্ষমা করিনি...ক্ষমা করব না।

খুব অস্ফুট স্বরে যেন টুকরো টুকরো আগুন ছড়াতে ছড়াতে বামাসাধিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

www.bengaliebook.com